আবর্ত্ত

উৎসর্গ

মাতৃ-চরণে

আবর্ত্ত

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৪৪

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

চন্দ্রোদয়	১
কুজ্ঝটিকা ও কিরণ	৩৩
আবর্ত্ত	৫৩
স্কুলের ছেলে	৭৬
অপূর্ণ	৯৭
মৃত্যু-উৎসব	১৩১
মণ্ডল-বাড়ি	১৪৭

চন্দ্রোদয়

অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংসারে অনেক ঘটে। অবনীনাথ ছয় মাসের মধ্যে যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবেন, জামগাঁয়ের ইতর ভদ্র কেহই ইহা আশা করে নাই। তাও বিবাহ করিলেন ত্রয়োদশী কন্যাকে,—আজন্ম পাড়াগাঁয়ের মধ্যে যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, শিক্ষার স্বল্প আলোকও যাহার ললাটে রেখাপাত করে নাই, বুদ্ধির দীপ্তিতে চক্ষু দুইটি মোটেই সমুজ্জ্বল নহে। বালিকাসুলভ হাসিতে মুখখানি এতই তরল হইয়া উঠে যে, ভিতরকার নির্ব্বোধ সারল্যটুকু অতিমাত্রায় চোখে ফুটিয়া উঠে। মাথায় ঘোমটা টানিবার সুচারু ভঙ্গিটুকু নাই, অঙ্গসঞ্চালনে কোথাও রহস্যের গন্ধটুকু পাওয়া যায় না। চোখের পানে চাহিলে মনে হয়, এত শীঘ্র চেলি পরাইয়া মায়ের কোল হইতে রূপকথার এই শ্রোত্রীটিকে কেনই বা টানিয়া আনা হইল! এ চোখ যাহা-কিছু কৌতুককর বিষয় দেখিয়াই বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইতে পারে, সন্ধ্যার চাঁদ ধরিয়া দেওয়ার প্রলোভনে লোভাতুর হইয়া উঠে এবং রাত্রি গভীর হইতে না হইতে অনায়াসে ঘুমভারে আলস্যে মুদিয়া আসে।

অথচ শিক্ষিত অবনীনাথ ইহাকেই বিবাহ করিয়া বসিলেন। কলেজ হইতে পাস করিয়া কয়েক বৎসর উপযুক্ত পাত্রী না পাওয়ায় যে অবনীনাথ মায়ের কত অশ্রুমাখা মিনতি উপেক্ষা করিয়াছেন, কত জমিদার-কন্যা শিক্ষিতা নহে বলিয়া রূপ ও রূপার বোঝা লইয়াও প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছে।

অবশেষে সুদূর মফস্বলে শিকার করিতে গিয়া কোন বন্ধুর গৃহে আতিথ্য লাভ করিয়া তাহারই ভগ্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। নম্র ও ত্রুটিহীন আচরণে সে তরুণ জমিদারের মনে অল্প একটু আলোকপাত করিতে পারিয়াছিল। কোন পক্ষেরই আপত্তির হেতু ছিল না; কাজেই মৃদু আলোক উজ্জ্বল হইতে বিলম্ব হয় নাই।

তারপর—আটটি বৎসর। পুরাতন পৃথিবীতে নূতন পথিকেরা যখন ভালবাসিতে আরম্ভ করে, তখন অতীতে বা বর্ত্তমানে কেহ যে তেমন ভালবাসিতে পারিয়াছে বা পারে, এ ধারণা তাহাদের থাকেই না এবং মনে করে, বহুবর্ষের পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রেমসুধা-কিরণে স্নান সারিয়া নবীনতর সম্পদে সার্থক হইল। আটটি বৎসরে অবনীনাথ মহাল পরিদর্শনে যান নাই, শিকার অভাবে বন্দুকে মরিচা ধরিবার জোগাড় হইয়াছিল, বন্ধুদের গানের মজলিসও নীরব হইয়া আসিয়াছিল। কি ঘরে, কি বাহিরে স্ত্রৈণ আখ্যাটি তিনি ভাল করিয়াই লাভ করিয়াছিলেন।

সুজাতা যখন তখন অনুযোগ করিয়া কহিত, এ রকম সর্ব্বত্যাগী হয়ে কতদিন কাটাবে?

অবনীনাথ হাসিয়া উত্তর দিতেন, অন্তর যার পরিপূর্ণ, বাইরের ত্যাগ তার পক্ষে কিছুই না।

কোন দিন বা সুজাতা প্রশ্ন করিত, তোমার মহালের আয় কত?

মাথা চুলকাইয়া অবনীনাথ অন্য কথা পাড়িতেন, চল সু—, মহালে বেড়াতে যাবে ?

সুজাতা হাসিয়া বলিত, তুমি মহালে যাবে প্রজা শাসন করতে, আমার সেখানে কি কাজ ?

অবনীনাথ উত্তর দিতেন, তাদের বলব মহারাণীর কাছে দরবার করতে।

সুজাতা সহসা গম্ভীর হইয়া কহিত, ঠাট্টা নয়, মহাল দেখা তোমার দরকার। তবে আমায় যদি নিয়ে গিয়ে বনবাসে দিয়ে আসতে চাও তো সঙ্গে নিতে পার।

অবনীনাথ সবিস্ময়ে বলিতেন, তোমায় বনবাস দোব আমি!

সুজাতা হাসিয়া বলিত, প্রজানুরঞ্জনে সীতাদেবীকে যিনি বনে পাঠিয়েছিলেন তিনি তো তোমাদেরই আদর্শ।

অবনীনাথ ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিতেন, আমি জানতুম না তোমার শরীর খারাপ।

এই হাস্যপরিহাস একদিন যে সত্য হইবে তাহা কে জানিত!

মাস কয়েক পরে চন্দনী মহালের ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হইয়া উঠিল যে, জমিদারের উপস্থিতি ভিন্ন সে গোলযোগের কোনও নিষ্পত্তিই সম্ভব ছিল না। আসন্নপ্রসবা সুজাতাকে ফেলিয়া অবনীনাথ কিছুতেই প্রবাসযাত্রায় সম্মত হইলেন না। এদিকে পত্রের পর পত্র আসিয়া জমিতে লাগিল; ক্রমে কথাটা সুজাতাও শুনিল। শুনিয়া সে কাঁদিয়া কহিল, তোমার জন্যে আমার কি একটুও স্বস্তি নেই? এমন আনন্দের দিনে তুমি আমায় কাঁদাতে চাও?

অবনীনাথ সস্নেহে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, পাগল! সুস্থাবস্থায় আট বছর তোমার কাছ-ছাড়া হই নি, আর এখন—

সুজাতা কহিল, না গেলে বিষয় যাবে।

অবনীনাথ কহিলেন, যায় যাক, ওর চেয়ে বড় সম্পত্তি তুমি আমায় দিয়েছ।

এ কথায় গর্ব্বিত না হয় এমন নারী কোথায়ই বা আছে? তথাপি সুজাতা চোখের জল ফেলিয়া কহিল, বিষয়ের জন্যে আমিও ভাবি না, কিন্তু যে আসছে তাকে কাঙাল সাজাতে তোমার এত সাধ কেন? সে আসার সঙ্গে যদি বিষয় যায়, লোকের কানাকানি আমি সইতে পরিব না। তার সৌভাগ্যকে তুমি অমন ক'রে অন্ধকার ক'র না।

অবনীনাথ যতবার সান্ত্বনা দিয়া চোখের জল মুছাইয়া দেন, বিগলিত তুষারের মত সে অবিরল ধারা ততই বহিতে থাকে। সুজাতা নিজে সমস্ত সহিতে পারে, কিন্তু সন্তানের দুর্ভাগ্য লইয়া অন্যে যে সহানুভূতি দেখাইবে—ইহা তাহার অসহ্য।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া অবনীনাথ যাত্রার আয়োজন করিলেন।

যাত্রাক্ষণে সুজাতা আসিয়া প্রণাম করিতেই হঠাৎ উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়া অবনীনাথ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। সুজাতার অনেক কথা বলিবার ছিল, অবনীনাথেরও ছিল, কিন্তু অকরুণ অশ্রুপ্রবাহ কোনও কথাই বলিতে দিল না।

অবনীনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন পাঁচ দিনে মহালের কাজ সারিয়া ফিরিবেন। হয়তো ফিরিতেনও, কিন্তু লোকনাথ-পুরের দ্বারিক বলিয়া এক অবাধ্য বর্দ্ধিষ্ণু প্রজা বড় গোল বাধাইল। রফা-নিষ্পত্তিতে সে রাজি না হইয়া প্রজার মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতে লাগিল। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজ দিয়া তাহাকে কাছারি-বাড়িতে বাঁধিয়া আনিয়া কিছু শাসন করা যায় না। শাসন করিতে গেলেই দাঙ্গার সম্ভাবনা। অপর পক্ষেরও লোক এবং অর্থ

দুইটি বলই প্রচুর। অথচ শাসন না করিলেও সমস্ত মহালের খাজনা আদায়ের আশা সুদূরপরাহত।

অবনীনাথ নায়েবকে কহিলেন, কি করা যায়? আমাকে শিগ্‌গির ফিরতে হবে।

নায়েব বলিল, আদালতের আশ্রয় ছাড়া অন্য পথ তো দেখি না। মামলার একদফা শুনানি পর্য্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতেই হবে।

সে কতদিন?

প্রায় দিন পনেরো লাগবে।

কিন্তু ততদিন তো আমি থাকতে পারব না। দু চার দিনে শেষ হয় না?

নায়েব বলিল, না হুজুর। এ মামলা অনেক দিন ধ'রে চলবে। কেবল জন-কতক দরকারী সাক্ষীর জন্যই এই কটা দিন আপনাকে থাকতে হবে। না হ'লে গোলযোগ হতে পারে।

সুজাতার অনুরোধ মনে পড়িল,—বিসয় যাওয়ার অপবাদ আমার সন্তানকে যেন স্পর্শ না করে। তার সৌভাগ্যকে তুমি অমন ক'রে অন্ধকার ক'র না।

উপায় নাই, থাকিতেই হইবে।

পনেরো দিনের জায়গায় কুড়ি দিন হইল।

মামলার কয়েক দফা শুনানি হইয়া গেলে নায়েব যেদিন প্রফুল্ল-মুখে জানাইল আর চিন্তার কারণ নাই, সেই দিনই অবনীনাথ গৃহযাত্রা করিলেন।

ভাদ্রের ভরা নদী। দুইটি তীরের রুক্ষতাকে ঢাকিয়া উঁচু পাড় অবধি টলটলে জলের ছলছলাৎ ধ্বনিটুকু ভারী মিষ্ট লাগে। কোথাও

কচুরিপানার ফুলে, কোথাও বা কুমুদ-কহ্লারে নদী সাজিয়াছে। উপরের নীল আকাশে ইতস্তত সঞ্চরণশীল টুকরা মেঘ নৌকার গতির সঙ্গে যেন বাজি রাখিয়া ছুটিয়াছে। কাশ কেয়ার বনে অপরূপ শুভ্রতা; সাদা পাল তুলিয়া নৌকা ছুটিয়াছে। শুভ্রতর মন হালকা মেঘের সঙ্গে কেন ছুটিয়া চলে না? ভাটিয়ালি সুরে মাঝির এমন যে গান—অবনীনাথ কেন দুই কান ভরিয়া শুনিতেছেন না? দীর্ঘ দিন পরে প্রবাসী আজ গৃহমুখী। প্রতীক্ষমানা সুজাতা জানালার সেই কপাট ধরিয়া দুইটি চক্ষুকে নদীর দিকে নির্নিমেষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখে জল, মুখে উৎকণ্ঠা। হয়তো বা নবজাত শিশুক্রোড়ে হাসিমুখে সে প্রত্যহ এই দিক পানে চাহিয়া থাকে। এই প্রবহমান নদীজলে নিত্য তাহার দৃষ্টির স্পর্শ স্রোতে স্রোতে ভাসিয়া চলে। সেই দৃষ্টির শক্তিই কি তরণীর শুভ্র পালে বায়ুর বেগ লাগাইয়া স্ফীত করিয়াছে, গতি দিয়াছে? সুজাতা তো দূরে নহে। এই জলের স্পর্শে তাহার কোমল স্পর্শটি ঠিক যেন বিদায়-দিনের অশ্রুমুখর স্পর্শের মত বিষণ্ণ।

অবনীনাথ নৌকায় শুইয়া হাত দিয়া নদীর জল ছুঁইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। সুজাতা আছে তো? আটটি বৎসর যে চোখের আড়াল হয় নাই, কেন সে কাঁদিয়া বাহুডোর শিথিল করিল? কেন সে প্রিয়কে দূরে ঠেলিয়া দিল? রাত্রির অন্ধকারের মত মনেও অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে। নদীর বাঁকে দপ করিয়া একবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অবনীনাথ বহুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া বুঝিলেন, গ্রামের শ্মশানে চিতা জ্বলিতেছে। কাহার প্রাণপ্রিয়তর ধন চলিয়া গেল? স্নেহ-ভালবাসার সমস্ত সম্পর্ক চুকাইয়া কে অকরুণ রাত্রির অন্ধকারে চিতায় গিয়া উঠিল? অগ্নিমুখে, মানুষকে ভয় দেখাইতে, চিতার উপর কাঠ তুলিয়া দিতেছে, কে উহারা? আগুন দেখিয়া প্রাণ কেন

হু হু করিয়া উঠে? মনে হয়, কি যেন ছিল, কি যেন নাই! রাত্রির অন্ধকার দস্যুর মত কি যেন লুটিয়া লইয়াছে! ওই অগ্নিজিহ্ব চিতার ধূমে ও আলোয় সেই অশুভ ইঙ্গিত। সুজাতা—সুজাতা—সুজাতা!

রাত্রি প্রভাতে পরিচিত ঘাটে আসিয়া নৌকা লাগিল। প্রাসাদ-বাতায়নে কোথায় সে মুখ? বাতায়ন বন্ধ। ঘাটে পরিচিত কেহ নাই। বিষণ্ণ প্রভাতের মত গ্রামখানি মৌন। অবনীনাথ একটিও কথা কহিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

ভৃত্য দুয়ার খুলিয়া প্রণাম করিল। অবনীনাথ তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না, একেবারে শয়নকক্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। কোথায় সুজাতা! কোথায় বা নবজাত আগন্তুকের কলহাস্য! অটল মৌনতায় ঘরখানি মিনতি করিয়া বলিতেছে, সে নাই—সে নাই।

বিকৃত কণ্ঠে অবনীনাথ চাকরটাকে ডাকিলেন। সে প্রভুর সামনে আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। অবনীনাথের চোখের সম্মুখে কল্যকার অন্ধকার রাত্রি দ্রুতবেগে অবতীর্ণ হইল, নদীর বাঁকে অমনই সেই চিতা জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই চিতার আলোকে সুজাতা যেন স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিল। অবনীনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন না, সমস্তই শুনিলেন। মাত্র দিন দুই হইল মৃত সন্তান প্রসব করিয়া সুজাতা তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। বুঝি সন্তানের লালনাকাঙ্ক্ষায় সে তাহার পাছু পাছু গিয়াছে। দীর্ঘ আটটি বৎসরের মধ্যে যেমন অবসর মিলিয়াছে অমনই সুজাতা পলাইয়া গেল। যাক, নিষ্ঠুর সুজাতা!

দিনকতক অবনীনাথ সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন না, কাহারও সহিত কোন কথা কহিলেন না। সুজাতার এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান তখনও কৌতুক বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল, পাশের ঘর হইতে এখনই সে ছুটিয়া আসিবে; আসিয়াই চোখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিবে, কেমন জব্দ ?

হাঁ, জব্দ, খুব জব্দই সে করিয়াছে !

আশ্চর্য্য কালের শক্তি।

-- কয়েক দিন পরে অবনীনাথ সহজ মানুষের মতই বাহির হইলেন। পরিবর্ত্তনের মধ্যে দেহের যৌবন প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, গম্ভীর মুখের কথাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর হাসিটির অন্তর্দ্ধান ঘটিয়াছে। তা হউক, দীর্ঘ আটটি বৎসর পরে অবনীনাথকে পাইয়া বন্ধুরা খুব সমবেদনা জানাইল, নায়েব আমলারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; মহালে মহালে খবর গেল জমিদার আসিবেন।

জমিদার সত্যই মহালে গিয়া জমিদারির তত্ত্ব লইতে লাগিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চন্দনী মহালের দায়ে সুজাতাকে হারাইতে হইয়াছে, সেই চন্দনী মহালের অবাধ্য প্রজা দ্বারিককে তিনি এমনই বশীভূত করিয়া ফেলিলেন যে, কোর্টের মামলার অকস্মাৎ নিষ্পত্তি হইয়া গেল। এই দ্বারিকেরই ত্রয়োদশী কন্যা চাঁপাকে তিনি বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলেন।

মা ছিলেন না, মাসি পিসির দল বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। স্ত্রী-আচারের ত্রুটি কোথাও হইল না, কেবল বাহিরে ভোজন-প্রত্যাশীর দল মনঃক্ষুণ্ণ হইল। না বাজনা, না আলো, না জমিল কোলাহল। জমিদার হইয়া এমন বিবাহ কি না করিলে চলিত না !

চাঁপা প্রথমটা এত বড় বাড়ি দেখিয়া বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করিয়া

চাহিয়া রহিল। ঘরের যেন সংখ্যা নাই। যেমন বড়, তেমনই কি বিচিত্র সাজসজ্জা! যত রাজ্যের মণিহারী দোকান ঘরের মধ্যে সাজানো! প্রকাণ্ড আলমারির পাশে দিব্য লুকোচুরি খেলা জমে! অত বড় খাটখানায় হাতখানেক উঁচু গদির উপর শুইয়া থাকিতেও ভয়-ভয় করে! বড় একলা বোধ হয়! পাঁচ-ছয়টি খেলার সাথী জুটিলে গদির উপর হুড়াহুড়ি করিতে বেশ লাগে! উপরের বেলোয়ারী ঝাড়টা, কাচের কত রকমই যে রং!

উহারা বলিতেছে, এসব তোমারই মা, দেখে শুনে নাও।

মাগো! এত জিনিস নাকি দেখিয়া লওয়া যায়! ছবিতে, সোফায়, ঘড়িতে, গদি-আঁটা চেয়ারে, পাথর-বসানো টেবিলে, দেয়াল-আরসিতে ঘরগুলি যেন যাদুঘর! শুধু ঘণ্টা কেন, কয়েকটি দিন ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না। চাঁপা ইহারই মধ্যে দিশাহারা হইয়া যাইতেছে। এ বাড়িতে নাকি মানুষ বাস করিতে পারে!

বিবাহের কোন অনুষ্ঠানই বাদ দিবার উপায় নাই। ফুলশয্যার আয়োজনও হইল।

ফুলের গহনায় আগাগোড়া সাজিয়া চাঁপা আর এক জগতের মানুষ হইয়া গেল। একটু ফাঁক পাইয়াছে কি বড় আরসিটার সামনে দাঁড়াইয়া হাত-মুখ ঘুরাইয়া এই অপরূপ সাজসজ্জা দুইটি বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন মেলিয়া দেখিতেছে। সুগন্ধি পান খাইয়া ঠোঁট দুইখানি কেমন লাল হইয়াছে! মাথায় ফুলের মুকুট—যেন যাত্রাদলের রাণীর মত! কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবারই কি জো আছে! লোক পিছনে লাগিয়াই আছে। এ যায় তো ও আসে। ঘোমটা দিয়া বড়াই-বুড়ীর মত বসিয়া থাকা—কতক্ষণই বা পারা যায়! লোকজন চলিয়া গেলে অবসর মিলিল যখন, তখন ঘুমে চাঁপার চক্ষু ঢুলিতেছে। ফুলে-ভরা উঁচু খাটখানায়

বসাইয়া উঁহারা চলিয়া গেলে চাঁপা নামিয়া বড় আরসিটার সামনে দাঁড়াইতে পারিল না, সেই বিছানায়ই একটা পাশ-বালিশ মাথায় দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

নিয়ম রক্ষা করিতে অবনীনাথ আসিয়াছিলেন। ঘুমবিবশা বালিকার সুপ্ত মুখের পানে চাহিয়া চক্ষুর দৃষ্টি অত্যন্ত কোমল হইয়া উঠিয়াছিল; যে কেহ দেখিলে বলিত, সে দৃষ্টি অশ্রুপতনের নিকটতম মুহূর্ত্তের। পূর্ব্বস্মৃতি কিনা কে জানে!

বেশিক্ষণ অবনীনাথ সে দিকে চাহিতে পারেন নাই, সেটির উপর শুইয়া জীবনের এই স্মরণীয় রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিতেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, বালিকা-বধূ উঠিয়া আসিয়া আঁচল দিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছে। চাঁপা তাঁহাকে চাহিতে দেখিয়া চাপা গলায় বলিল, বড্ড ঘেমেছ কিনা, ঘুমোও, আমি বাতাস দিচ্ছি।

এক জাতের মেয়ে আছে, অতি শৈশব হইতে যাহারা পাকিয়া যায়, অর্থাৎ পাকা কথা ও পাকা আচরণে অভ্যস্ত হইয়া উঠে; বাবা মা আদর করিয়া সেইসব মেয়ের নাম দেন বুড়ী। চাঁপাও সেই জাতীয়া। বুদ্ধি কতটুকু আছে বলা যায় না, কিন্তু যেটুকু শেখে, মনে গাঁথিয়া রাখে। বিদায়কালে মা বার বার করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন—পতি পরম গুরু। দেখ মা, তাঁর সেবা করতে ভুলো না, তাঁর পায়ে কাঁটা ফুটলে বুক পেতে দেবে। চাঁপা সে কথার এক বর্ণও ভুলে নাই।

অবনীনাথ কিন্তু সেবা পাইবার জন্য বিবাহ করেন নাই। চাঁপার এই অকালপক্কতায় প্রথমটা কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মুখের সে কৌতুক-চিহ্ন মিলাইয়া গেল। গম্ভীর

মুখে তিনি উঠিয়া পড়িলেন এবং একটিও কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাঁপা খানিকক্ষণ অবাক হইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিল। অবনীনাথের শয়নকক্ষ হইতে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্ব ধার খোলা, পশ্চিমে তাহার ঘন বাঁশঝাড়। উত্তর দক্ষিণে নারিকেল গাছ, স্নান করিবার ঘাট ওই দিকে। কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলে খানিক সাঁতার কাটিয়া লাফালাফি করিয়া বেড়াইলে চাঁপা হয়তো তৃপ্তি পাইত, কিন্তু বদ্ধ ঘরের মধ্যে সাবান ঘষিয়া, গন্ধ তৈল মাখাইয়া, স্নান শেষ করাইয়া, সাজাইয়া, জল খাওয়াইয়া চাঁপাকে উঁহারা সেই জানালার ধারেই বসাইয়া দিয়াছেন, যেখান হইতে মায়ের মত স্নেহ-বাহু বাড়াইয়া পুকুরের জল আকর্ষণ করিতেছে। সেদিকে চাহিয়া চাঁপার চোখে জল আসে, কেবল মাকেই মনে পড়ে।

দিন গেল, আবার রাত্রি আসিল ; কিন্তু অবনীনাথ আসিলেন না। চাঁপার দুঃখ মায়ের জন্য। অবনীনাথের পানে তখনও সে পূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইতে পারে নাই, কাজেই তাঁহার না-আসায় চাঁপার কোন কষ্ট হইল না।

দিন সাতেক পরে বাবাকে দেখিয়া চাঁপা যেন হাতে স্বর্গ পাইল।

বাবা, আজই আমরা যাব তো ? মা কেমন আছে ?

দ্বারিক কেমন যেন ছলছল চোখে চাহিয়া বলিলেন, তোর মা ভালই আছে, চাঁপা।

চাঁপা উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কটার সময় যাবে বাবা ?

দ্বারিক চোখের উপর হাতের উল্টা পিঠ রাখিয়া হাতখানা টানিয়া লইলেন ও করুণ কণ্ঠে বলিলেন, আমি এখনই যাব, কিন্তু তোকে তো এরা পাঠাবে না মা।

চাঁপা যেন আকাশ হইতে পড়িল, কেন বাবা ?

জমিদার-বাড়ির নিয়ম। বিয়ে হয়ে গেলে বউ আর বাপের বাড়ি যায় না।

চাঁপা সহসা হাসিয়া উঠিল, না, যায় না! এরা তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে বাবা।

দ্বারিকও করুণভাবে হাসিয়া বলিলেন; ঠাট্টা করবার সম্পর্ক নয় রে, পাগলী। জামাই জানিয়েছেন, তাঁদের বংশে আগে কি নিয়ম ছিল না-ছিল সে কথা নয়, এখন থেকে এই নিয়ম হ'ল।

চাঁপা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, ইঃ, নিয়ম হ'ল! বললেই হ'ল আর কি! দাঁড়াও বাবা, আমি আসছি।

দ্বারিককে বসাইয়া চাঁপা সোজা লাইব্রেরি-ঘরে গিয়া ঢুকিল। ঢুকিয়াই পাঠরত অবনীনাথকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তুমি নাকি আমায় বাবার সঙ্গে যেতে মানা করেছ?

অবনীনাথ মুখ তুলিয়া চাঁপার পানে চাহিলেন। নিতান্ত বালিকা! রাগিয়া গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দুয়ারে হাত রাখিয়া এমন দাঁড়াইয়াছে, ভঙ্গি দেখিলে হাসি পায়। কিন্তু অবনীনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, হাঁ।

চাঁপা উদ্ধত কণ্ঠে কহিল, কেন?

গম্ভীরভাবে উত্তর হইল, এ বাড়ির এই নিয়ম।

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চাঁপা থতমত খাইয়া গেল, আকস্মিক উত্তেজনা কাটিয়া সে কেমন অসহায় হইয়া পড়িল। ভীতস্বরে বলিল, তবে কি আমি মাকে দেখতে পাব না?

অবনীনাথ চাঁপার পানে চাহিলেন না। মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিলেন, এ বাড়ির যা নিয়ম তাই মানতে হবে, এর বেশি জিজ্ঞাসা ক'র না।

বাক্যশেষে তিনি অন্য দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। চাঁপা আর পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

মাস কয়েক পরেই হইবে, অবনীনাথ সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, চাঁপার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ কৌতূহলী হইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন, উঠানের উপর একটি স্ত্রীলোক এক অন্ধ বালকের হাত ধরিয়া বোধ হয় ভিক্ষার জন্য প্রার্থনা করিতেছে। বামী ঝি ছোট রেকাবিতে ভরিয়া মুঠা দুই চাল দিয়াছে, ভিখারিণীর তাহা পছন্দ হয় নাই। সে ভোজন-দাবি জানাইয়া কাতরোক্তি করিতেছে। চাঁপা নীচের বারান্দা হইতে বামীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছে, তোর কি আক্কেল নেই, বামী! ওই দু মুঠো চালে ওদের মা বেটার পেট ভরে? এদিকে আয়, আমি ভাঁড়ার থেকে চাল ডাল আলু বেগুন দিচ্ছি, ওকে দে। আর বল, আজ এইখানেই ও খাবে।

চাঁপার এই গৃহিণীপনা দেখিয়া অবনীনাথ হাসিলেন, হাসির সঙ্গে চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। মেয়েদের বয়সের বিচার করিয়া বিজ্ঞতার পরিমাপ চলে না। গৃহিণী হইবার জন্য অতি শৈশব হইতে প্রকৃতি এই অমেয় দানে উহাদের সমস্ত বৃত্তিকে সুকোমল করিয়া গড়িয়াছেন। ত্রয়োদশী চাঁপার এই কোমল বৃত্তি বিংশবর্ষীয়া সুজাতার মধ্যে অবনীনাথ কতদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই গৃহিণীপনার উল্লেখে কত কৌতুক-রহস্যই না জমিয়া উঠিত! অবাধ্য মন, অতীত লইয়া জাল বুনিতে ভালবাসে।

অবনীনাথ দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলেন। লাইব্রেরি-ঘরে বসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিয়া জগৎ ভুলিতে চাহিলেন, কিন্তু অতীতের অনুসরণ সেখানেও।

সুজাতা সেখানেও পা টিপিয়া প্রবেশ করিতেছে, একখানা বই খুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আরম্ভ করিয়াছে। অবনীনাথ হাসিয়া কাগজ বন্ধ করিলেন।

আজ কি আমায় পড়তে দেবে না সু?

না, স্বার্থপরের মত মনে মনে পড়া আমি পছন্দ করি না। চেঁচিয়ে পড়, পড়তে পড়তে গল্প কর, তবে তো পড়ার আমোদ।

তুমি জান না, মনে মনে পড়ায় সমস্ত অন্তর এক হয়ে যায়, গাঢ় অভিনিবেশ আসে; চেঁচিয়ে পড়লে আবৃত্তিটা হয়ে ওঠে মুখ্য, অন্তরের যোগ নষ্ট হয়ে যায়।

আমি তো জানি তর্ক চললেই অন্তরের যোগ—

হাসিয়া অবনীনাথ বলিলেন, তর্ক না চললেও যোগসূত্র ছিন্ন হয় না; দেখ প্রমাণ। বলিয়া বাহু বাড়াইলেন। অবনীনাথের বাহুবন্ধনে সুজাতা কখনও বাঁধা পড়িত, কখনও বা ছুটিয়া পলাইত। সেই লীলামুখর মুহূর্ত্তগুলি কি রোমাঞ্চই যে জাগায় মনে!

কেন সুজাতা না বলিয়া লুকাইল? সুজাতার আসনে ক্ষণিকের উত্তেজনাবশে এ কাহাকে আনিয়া বসাইয়াছেন? জীবনের সঙ্গিনীরূপে যাহাকে কল্পনা করিতেও মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠে, সে কি কোন দিন অন্তর-সান্নিধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? না—না। দ্বারিকের অবাধ্যতার শাস্তি দিতে এ বালিকাকে জব্দ করা কেন? আবার করুণা! এ যে দ্বারিকের কন্যা, তেমনই ক্রূর, কপট, ছলনাপটু। নহিলে অতটুকু বালিকা কি সাহসে অবনীনাথের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আসে? কি সাহসেই বা সুজাতা যে আসনে বসিয়া এ বাড়ির সর্ব্বময়ী হইয়াছিল, সেই আসনে বসিবার স্পর্দ্ধা রাখে? সুজাতাকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য বালিকা নির্ব্বোধ সাজিয়াছে। সর্পের খলতা উহার অন্তরে।

উত্তেজনায় অবনীনাথ বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ও বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, বামী, এ বাড়ির যা নিয়ম, ভিখিরী এলে যেমন মুষ্টি-ভিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তেমনই দেওয়া হয় যেন। এক মুঠো খায় খাক, কিন্তু ভাঁড়ার লুট করবার কোন দরকার দেখি না।

আদেশ দিয়াই তিনি লাইব্রেরি-ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

চাঁপা এ আদেশ গায়েও মাখিল না। বামীকে বলিল, পুরুষমানুষের এত খোঁজে দরকার কি বাপু, ভাঁড়ার থাকবে মেয়েদের জিম্মায়। তুই দে বাপু! আহা, দেখলে মায়া হয়।

বহুদিন পরে চাঁপা লাইব্রেরি-ঘরে আসিয়া অবনীনাথকে বলিল, তুমি কি নিষ্ঠুর, অনায়াসে বললে কিনা ওদের মুষ্টি-ভিক্ষা দাও!

অবনীনাথের মন ভাল ছিল না, রুক্ষকণ্ঠেই বলিলেন, আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি, কারও কথা মেনে আমায় চলতে হবে নাকি?

চাঁপা সহজ ভাবেই বলিল, বাঃ রে! আমি তাই বলছি নাকি? খানিক থামিয়া বলিল, এক গ্লাস সরবৎ খাবে?

না।

বড্ড ঘেমেছ যে, ঘরে একখানা টানা-পাখা রাখলেই তো পার।

তুমি যাও, পড়ার সময় বিরক্ত করলে পড়া হয় না।

আহা, আমি যেন তোমায় সর্ব্বক্ষণই বিরক্ত করি! কি বই ওখানা?

তুমি বুঝবে না। যাও, ওধারে কি রান্না হচ্ছে দেখ গে।

চাঁপা শশব্যস্তে উঠিয়া বলিল, যাই, যেটি না দেখব জ্বলিয়ে পুড়িয়ে রাখবে। হ্যাঁগা, তুমি নাকি চপ খেতে ভালবাস? করব দুখানা মাছের চপ?

অবনীনাথ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, না। আমি কিছুই খেতে ভালবাসি না, তুমি যাও।

চাঁপা মৃদুস্বরে বলিল, শুনেছি, দিদি নাকি রোজই চপ—

চাঁপা!

রূঢ় আহ্বানে চাঁপা চমকিত হইয়া উঠিল। অবনীনাথের মুখে সমস্ত রক্ত আসিয়া জমিয়াছে। মুখখানি ফুলিয়া দ্বিগুণ হইয়াছে, সেদিকে চাহিলে বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে।

রূঢ়স্বরেই অবনীনাথ বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, জান না মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করলেই মস্ত বড় সান্ত্বনা দেওয়া হয় না। তোমার সেবা দিয়ে, দরদ দিয়ে, মিষ্টি কথা দিয়ে আমায় জ্বালিও না। যাও।

চাঁপা নিরুত্তরে চলিয়া গেল।

অবনীনাথ তাহার গমনপথের পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর মাথা রাখিলেন এবং অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিলেন, সুজাতা।

চাঁপা কিন্তু এ বিরাগ গায়ে মাখিল না, বরং বেশি করিয়া অবনীনাথের সেবায় মনোযোগ দিল।

সকালে উঠিলেই গরম চা, টোষ্ট, ডিমসিদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাপড় জামার জন্য সাতটা আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হয় না, জুতাগুলি চকচকে হইয়া দুয়ারের বাহিরে সাজানো থাকে। ভাতের থালায়ই কি কম পারিপাট্য! ঘন মুগের ডাল, উচ্ছে-পলতার সুক্ত, মাছের কালিয়া এবং চপ, সরু সরু আলু মুচমুচে করিয়া ভাজা, পোস্ত-বড়া ইত্যাদি যত্ন করিয়া কে থালার পাশে সাজাইয়া রাখে।

খাইতে বসিয়া সুজাতার সেবানিপুণ দুইটি করের পরিচর্য্যা মনে পড়িয়া প্রাণটা হু হু করিয়া উঠে। সে কি নেপথ্যে থাকিয়া এই

আয়োজনসম্ভারে অবনীনাথের প্রতি খরদৃষ্টি রাখিয়াছে? ডালের বাটিতে হাত দিতেই মনে হয়, সুজাতা সম্মুখে বসিয়া বলিতেছে, ওটুকু খেয়ে ফেল, নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধলাম। মাছের ডালনায় বেশি ঝাল হয়েছে বুঝি? না না, চপ রাখতে পাবে না।

তুমি খাবে, থাক।

ও হরি! আমি যেন না রেখেই তোমায় দিয়েছি।

কই দেখি, কেমন রেখেছ!

তোমার বাপু সব অনাসৃষ্টি! আবার হেঁসেল থেকে টেনে আনি! এই দেখ, হ'ল তো?

এত খেয়ে আমার উঠবার ক্ষমতা থাকবে না সু। তোমায় কিন্তু টেনে তুলতে হবে।

সত্য সত্যই সুজাতা অবনীনাথের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিত।

খাওয়া আর হয় না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অবনীনাথ উঠিয়া পড়েন।

নেপথ্যচারিণী চাঁপার বুকেও সেই নিশ্বাস গাঢ় হইয়া উঠে। সাহস করিয়া সম্মুখে আসিয়া সে অনুরোধ করিতে পারে না। সে জানে, অবনীনাথ তাহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারেন না। চাঁপাকে এড়াইতে তিনি বৈঠকখানায় শয়নকক্ষ করিয়াছেন। তা করুন, চাঁপার তাহাতে ক্ষোভ নাই। কিন্তু চাঁপা এমন কি অপরাধী যে সম্মুখে আসিলেই অবনীনাথের সৌম্য মুখে কঠিন রেখা ফুটিয়া উঠে, বাক্য হইয়া উঠে কটু এবং মুখ না তুলিয়াই বিরক্তিভরে তিনি ঘরের বাহিরে চলিয়া যান! এঁরা বলেন, বউয়ের শোকে অমন হয়।

কিন্তু চাঁপা বুঝিতে পারে না—একজনের শোকে দগ্ধ হইলেই কি আর একজনকে অকারণে দগ্ধ করিতে ভাল লাগে? যে মানুষ

হাসিয়া কথা বলিতে পারে সে মানুষ কেমন করিয়া নির্দ্দয়ের মত পরমুহূর্ত্তে মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামাইয়া আনে ?

চাঁপার সাহস একবিন্দু নাই। অবনীনাথের পায়ের শব্দ পাইলেই সে কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। অথচ তাঁহার সুখ-সুবিধা আহার-পরিচ্ছদের সুবন্দোবস্ত করিতেও তাহার চেষ্টার অন্ত নাই।

বয়সের সঙ্গে চাঁপার ভয় বাড়িতেছে। সে বুঝিতেছে, অনাহূত হইয়া সে এখানে আসিয়াছে। তাহার এই অবাঞ্ছিত আগমনে বাড়ির হাওয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উপায় কি ? আকাশ পাতাল ভাবিয়াও চাঁপা নিজের দোষ খুঁজিয়া পায় না। এতই যদি অপ্রীতিকর সে, উঁহারা কেন তাহাকে বাবার কাছে পাঠাইয়া দেন না! মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া তো সে দুই দিনেই এই দুঃস্বপ্ন ভুলিয়া যাইবে।

অবসর পাইলেই চাঁপা জানালায় বসিয়া পুকুরের পানে চাহিয়া থাকে। দুপুরের রৌদ্রে যখন চারিদিক উত্তপ্ত হইয়া উঠে, দূর মাঠে ধোঁয়ার মত সূর্য্যদেব রৌদ্রের জাল বুনিয়া চলেন, আতপ্ত গাছের পাতা দোলাইয়া অগ্নিপ্রবাহের মত বায়ু বহিয়া চাঁপার চোখ মুখ ঝলসাইয়া দেয়, তখন বাঁশঝাড়ের নীচে পুকুরের জল ছুঁইয়া যে ঝোপটা কুঞ্জ রচনা করিয়াছে তাহারই ছায়ায় অদৃশ্য এক ডাহুক-দম্পতির বিশ্রম্ভালাপ বড় মধুর হইয়া তাহার কানে বাজে। উত্তপ্ত গরাদে মাথা রাখিয়া একমনে সেই ডাক শুনিতে শুনিতে চক্ষু মুদিয়া ভাবে, ঠাণ্ডা মেঝে জলে মুছিয়া আধ-অন্ধকার বারান্দায় তাহার মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া গুনগুন স্বরে সংসারের কাহিনী বলিতেছেন, পতিসেবা পরম ধর্ম্ম। সংসারে স্বার্থত্যাগ না করিলে সুখ মিলে না। সীতার কাহিনী, সাবিত্রীর পুণ্যগাথা, পদ্মিনীর জহরব্রত, কত সে মিষ্ট গল্প। হয়তো তন্দ্রা আসে, গরাদে হইতে মাথা উঠাইয়া মেঝেয় সে ঢলিয়া পড়ে, এবং

ডাহুক-দম্পত্তির সেই সুমিষ্ট ডাক শুনিতে শুনিতে একেবারে ঘুমের রাজ্যে চলিয়া যায়।

চাঁপার চলনে সে চঞ্চলতা নাই, বাক্যে বাহুল্য নাই, দৃষ্টিতে অসংশয়তাই বা কোথায়? ভরা নদীর মত অলস মন্থর; লজ্জার অবগুণ্ঠনে চাঁপা মুখের অর্দ্ধেক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুজাতার প্রকাণ্ড ছবিটার পানে সে একদৃষ্টে তাকাইয়া তাকাইয়া কত দিন ভাবিয়াছে, কি গুণ থাকিলে অমনটি হওয়া যায়? চোখে হাসি, মুখে হাসি, সর্ব্বাঙ্গে হাসির তরঙ্গ। জ্যোৎস্নামোড়া নদীর রূপালী স্রোত।

একদিন টুলটা এ দিকে টানিয়া আনিয়া আঁচল দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ছবিটা সে পরিষ্কার করিতে লাগিল। মাথায় কি খেয়াল চাপিল, বামীকে ডাকিয়া বাগান হইতে ফুল তুলিবার আদেশ দিল। ফুল আসিলে সারা দুপুর না ঘুমাইয়া একমনে সে মালা গাঁথিল। গাঁথা মালা লইয়া আবার গিয়া টুলে উঠিল এবং ছবির ফ্রেম বেড়িয়া মালাটি পরাইয়া নীচে নামিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। হাঁ, রূপ বটে! মা বলিতেন, ইন্দ্রাণী। সুজাতা সেই ইন্দ্রাণী। ঠাকুর-দেবতার মত সে প্রত্যহ এই ছবি পূজা করিবে এবং প্রার্থনা করিবে, হে দেবি, তোমার গুণের এতটুকু আমায় দাও। চক্ষুশূল না হইয়া স্বামীর উপকারে যেন লাগিতে পারি। তুমি ধূপের মত নিঃশেষ হইয়াছ, কিন্তু গন্ধে ঘর ভরিয়া আছ। সে গন্ধের একটুও কি আশীর্ব্বাদী স্বরূপ দিবে না?

দিন দুই আগে বড় মামীমা একখানা বই পড়িয়া সকলকে শুনাইতে-ছিলেন। তাহাতে ধূপের গন্ধের ঐ উপমাটা অমনই সুন্দর করিয়া দেওয়া আছে। শুনিয়া চাঁপার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল।

চোখে জল; কিন্তু চাঁপার মনে বড় তৃপ্তি।

ব্যথা জানাইবার সঙ্গিনী যেন সে এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছে।

সেইদিন অপরাহ্ণে অবনীনাথ সেই ঘরে কি প্রয়োজনে আসিয়াছিলেন; অকস্মাৎ পুষ্পমাল্যভূষিতা ঐ প্রতিমূর্ত্তির পানে চাহিয়া তিনি বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। চকচকে ফ্রেমের মধ্যে সুজাতার মুখের হাসিটি আজিও তো অম্লান আছে। স্বাস্থ্যসুষমায় ভরা টলটলে মুখ, খুশিতে উজ্জ্বল আয়ত চোখ, এমন কি চিবুকলগ্ন বাঁ-হাতের ঐ পরিপুষ্ট আঙুলটি পর্য্যন্ত ভঙ্গিতে অপরূপ। সুন্দর করিয়া গাঁথা মালায় সুজাতা সুন্দরতর হইয়াছে। সুজাতা তো সুন্দরই; যে শ্রদ্ধা দিয়া তাহাকে সুন্দরতর করিয়াছে তাহার প্রতি মন যেন কৃতজ্ঞ হইতে চাহে। বালিকার যত প্রগল্‌ভতাই থাকুক, পূজনীয়দের প্রতি প্রীতি সে পোষণ করে। অবনীনাথের পরিতুষ্টির জন্য তাহার নেপথ্যের আয়োজন বাহিরের লোক-ভুলানো নহে, সত্যই হৃদয়সম্পর্কে সম্পদশালী। তাঁহার সুজাতাকে যে অবহেলা করে না তাহার যত কৃত্রিমতাই থাকুক, অবনীনাথের অন্তর এতটুকু ঋণস্বীকারে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। চাঁপার রুচিজ্ঞানের প্রশংসা করা যায়, একমাত্র দোষ সে দ্বারিকের মেয়ে।

কিন্তু সে যাহাই হউক, সেদিন রাত্রিতে তিনি বড় তৃপ্তিতেই আহার করিলেন। দুইখানা চপ খাইয়াও আর একখানা চাহিয়া লইলেন; মাছের কালিয়াও বার দুই পাতে পড়িল।

পরিবেশনকারিণী আসিয়া চাঁপাকে বলিল, মা, আজ তোমার রান্না চমৎকার হয়েছে। বাবু, তরকারি চপ চেয়ে খেয়েছেন।

আনন্দে চাঁপার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, বামুনমাসী, আর কি চাই জিজ্ঞেস ক'রে এলে না কেন? হয়তো উঠে যাবেন।

বামুনমাসী বলিল, না মা, তিনি পেট ভ'রে খেয়েই উঠে গেছেন। যাও, পান দিয়ে এস।

দেবী প্রার্থনা শুনিয়াছেন। চাঁপা যে এ আনন্দবেগ বহিতে পারিতেছে না। ইচ্ছা হইতেছে ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির পায়ে মাথা রাখিয়া খানিকক্ষণ পড়িয়া থাকে। কিন্তু স্বামী হয়তো ওই ঘরেই বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন; এখন কি ও ঘরে যাওয়া যায়? আজ তাঁহার প্রসন্নতাকে নিজের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি দিয়া সে ম্লান হইতে দিবে না। খাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা নাই। খাওয়াইয়া যে অতুল আনন্দ, খাইতে গিয়া সে তৃপ্তিকে মাটি করা কেন?

রাত্রিতে চাঁপা একাই বড় ঘরে গিয়া শুইল। আনন্দে চোখের পাতায় ঘুম নামে না, কেবলই মনে হয়, আরও কি দিলে, কি করিলে ওই বিষণ্ণ মানুষটিকে বেশি তৃপ্তি দেওয়া যায়? কি করিলে দিনের পর দিন উঁহার প্রসন্ন অন্তর নয়নের স্বাস্থ্যসম্পদভরা দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হইবে, বলিষ্ঠ বাহুতে রক্তের প্রাচুর্য্য রঙে ফুটিয়া উঠিবে এবং মন্থর চলনে গতির দৃঢ়তা আসিয়া ঋজু দেহকে সতেজ করিবে?

ভাবিতে ভাবিতে হয়তো একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল, মৃদু যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনিতে সে তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চাঁপা খানিক কান পাতিয়া বুঝিল, সে ধ্বনি নিদ্রার মায়া নহে, রোগের যন্ত্রণায় কেহ কাতরোক্তি করিতেছে। শয়নকক্ষের পূর্ব্বধারে একতলার বৈঠকখানায় যেখানে অবনীনাথ শয়ন করেন সেইখানেই। তবে কি তিনিই? ধড়মড় করিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল এবং দুয়ার খুলিয়া ত্বরিতপদে বাহিরে আসিল।

রাত্রি গভীর। বিশাল অট্টালিকায় জনপ্রাণী জাগিয়া নাই। ছেলেবেলায় বহুবার শোনা পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার নিস্তব্ধ

প্রাসাদের মতই ভীতিগাম্ভীর্য্য ভরা। উপরে গাঢ় নীল আকাশ অসংখ্য নক্ষত্রখচিত। চন্দ্র নাই, কৃষ্ণপক্ষের তিথি। সেই অন্ধকারেই চাঁপা নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গেল। বৈঠকখানার দরজায় মিনিট দুই কান পাতিয়া সেই কাতরোক্তি শুনিয়া তাহার মনের সংশয় দূর হইল। অবনীনাথই বটে। কিন্তু গভীর রাত্রিতে. চাঁপা এ ঘরে ঢুকিয়া কি সান্ত্বনাই বা তাঁহাকে দিবে? হয়তো চাঁপাকে দেখিয়া ললাটের কুঞ্চন বাড়িবে, বেদনার সঙ্গে ক্রোধ মিশিয়া তাঁহাকে আরও অস্থির ও অসুস্থ করিয়া তুলিবে। চাঁপার নিজের জন্য এতটুকু ভয় নাই। আনন্দের সুদৃঢ় বর্ম্মে আজ তাহার সারা দেহমন ঘিরিয়া আছে, লাঞ্ছনা বা কটুবাক্য সেখানে ঘেঁষিতেই পারিবে না।

মন বাঁধিয়া সে দুয়ারে হাত দিল, সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার খুলিয়া গেল। স্তিমিত দীপশিখায় চাঁপা দেখিল, ঢালা ফরাসের উপর শুইয়া পাশ-বালিশটা বুকে চাপিয়া অবনীনাথ দেয়ালের দিকে ফিরিয়া কাতরোক্তি করিতেছেন। মাথার চুলগুলি বিছানার মতই বিশৃঙ্খল। বালিশের এ-ধার হইতে ও-ধার পর্য্যন্ত মাথা চাপিয়া, কখনও বা দেহ কুঁচকাইয়া, পাশ-বালিশের উপর হাতের চাপড় মারিয়া সেই যন্ত্রণাকে তিনি দমন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

দ্রুতপদে সে অবনীনাথের শিয়রে আসিয়া বসিল এবং কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করিয়া আপনার ডানহাতখানি তাঁহার উত্তপ্ত ললাটের উপর রাখিল।

অবনীনাথের মুখ হইতে আরামসূচক ধ্বনি বাহির হইল, আঃ!

তিনি একবার মাত্র রক্তচক্ষু মেলিয়া চাঁপার পানে চাহিলেন, কিন্তু কুঞ্চিত ভ্রূতে বিরক্তির রেখা ফুটিল না। ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিয়া নিস্পন্দের মত তিনি পড়িয়া রহিলেন।

চাঁপা সেবার আনন্দে জিজ্ঞাসাও করিল না, কি হইয়াছে! দুইটি ঠাণ্ডা নরম হাতের ছোঁয়ায় অবনীনাথের সমস্ত যন্ত্রণা মুছিয়া লইতে লাগিল। লঘুতম মুহূর্ত্তগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত। চাঁপার সারা দেহে রোমাঞ্চ জাগিল।

কিছুক্ষণ পর অবনীনাথের উত্তপ্ত ডানহাতখানি চাঁপার সেবারত হাতের উপর ঘন হইয়া লাগিল এবং নরম মুঠায় ভরিয়া আনন্দে মূর্চ্ছাতুরা চাঁপার বিবশ করপল্লবখানি বিস্তৃত বুকের উপর টানিয়া আনিয়া নিশ্চল হইল।

রাত্রি রহস্যময়ী। তাহার স্পর্শের যাদুদণ্ডে অন্ধকারমাখা মুহূর্ত্তগুলি রমণীয় হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার চেয়েও রহস্যঘন এই পীড়া ও সেবা। যন্ত্রণায় অতি অসহায় মানুষ সেবার স্পর্শ পাইতে সমস্ত দেহকে করিয়া রাখে উন্মুখ। সুখসন্ধানী চিত্তের এই নির্লজ্জ লোলুপতা দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তেই প্রখর হইয়া ফুটে।

কখন প্রভাত হইয়াছে, কখনই বা সূর্য্যদেব উঠিয়াছেন কেহ জানে না। রাত্রির সুকোমল অঙ্কে দুই জনেই সুপ্তিমগ্ন। প্রথমে চক্ষু মেলিলেন অবনীনাথ। চক্ষু মেলিয়াই তিনি আবার চক্ষু মুদিলেন। স্মৃতির অনুসরণ চলিতেছে বুঝি? নহিলে বুকের এত কাছে সুজাতাকে গাঢ় করিয়া তিনি বাহুর বাঁধনে বাঁধিলেন কি করিয়া? তাঁহারই বুকে গন্ধভরা কেশরাশি এলাইয়া সুজাতা পরম আলস্যে নিদ্রামগ্ন। একটি হাত তেমনই গলদেশ বেড়িয়া কণ্ঠহারের মত শোভাময়—অন্য হাত বুকের নীচে প্রসারিত। নিশ্বাসতরঙ্গে সুজাতা সুপ্তিময়ী। কি জানি চক্ষু চাহিলে যদি স্বপ্ন মিলাইয়া যায়! আবেশভরে অবনীনাথ চাঁপার শিথিল দেহ আকর্ষণ করিতেই সে জাগিয়া উঠিল। অবনীনাথের আকর্ষণে চাঁপা নিমীলিত নেত্রে উষ্ণ বুকের কাছে সরিয়া আসিল।

বুকের স্পন্দন এত ঘন ও উত্তাল যে চাঁপা বুঝি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরে। হায়, এই দণ্ডে যদি সে মরিতে পারিত! মরিলে এই মুহূর্ত্তব্যাপী অব্যক্ত অপরিমেয় সুখের তরঙ্গে দেহ ঢালিয়া হয়তো বা দেবলোকেই পৌঁছিত। কিন্তু অবনীনাথ পুনরায় চক্ষু মেলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অশুচিস্পর্শের দারুণ অস্বস্তিতে সমস্ত দেহ তাঁহার নিদারুণ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। বিদ্যুদ্বেগে আপন গলদেশ হইতে চাঁপার এলায়িত বাহু ছাড়াইয়া তাহাকে ঠেলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রূঢ় আঘাতে চাঁপাও চক্ষু মেলিল। চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সেই কঠিন মুখের সমস্ত শিরাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, রূঢ় দৃষ্টিতে তেমনই সুতীক্ষ্ণ তরবারির ঝলক—দীপ্তিতে যাহার অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া যায়; এবং ঋজু দেহের কঠিন ভঙ্গিমায় অপরিসীম ঘৃণা।

শিহরিয়া চাঁপা চক্ষু মুদিল।

বহুক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া দেখিল অবনীনাথ নাই। চাঁপা মনে মনে প্রার্থনা করিল, এই দণ্ডে হয় রাত্রি নামুক অথবা তাহার মৃত্যু হউক। নিতান্ত মরণ না হয় তো প্রবল জ্বর—একটা কঠিন অসুখ, নহিলে বাহিরের সূর্য্যালোকে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? লোকে তো বুঝিবে না পীড়িতের সেবা করিতে সে এখানে আসিয়াছে। উঁহারা মুখ টিপিয়া হাসিবেন। উপযাচিকার আতিশয্য দেখিয়া অন্তরালে হয়তো কত রহস্যই করিবেন।

কেহই কিছু বলিলেন না, অর্থাৎ বলিবার অবসর পাইলেন না। বাহিরে আসিতেই বামুনমাসী বলিলেন, আহা, লক্ষ্মী আবার যে কত দিনে এসে ঘর আলো করবেন কে জানে! শীগ্‌গির এস মা।

চাঁপা অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন, বাবু এইমাত্র হুকুম দিলেন ঘাটে নৌকো সাজাতে।

সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে নাও। পথ তো কম নয়; পৌঁছুতে সেই সন্ধ্যে।

চাঁপা আর সেখানে দাঁড়াইল না, নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিল। এ কঠোর শাস্তি তাহার কেন? সেবার অনধিকার-প্রবেশেই কি উনি কঠিনতম দণ্ড দিলেন? ঐ তো সেই পুকুর—প্রভাতবায়ু হিল্লোলিত ছোট ছোট ঢেউয়ে ভরা; দেখিলেই কলস ভাসাইয়া খেলা করিতে ইচ্ছা করে। কত দিন সে মায়ের সঙ্গে বাড়ির পুকুরে এমনভাবে জলক্রীড়া করিয়াছে। কিন্তু হায় রে! পুকুর দেখিয়া আজ কেন তাহার মাকেও মনে পড়িতেছে না? তাঁহার মুখের মিষ্ট গল্প, শাসন, সোহাগ, সুশীতল কোল—না, কিছুই নয়।

কেবলই মনে হইতেছে, সে সৃষ্টির আবর্জ্জনা। এ জগতে কোন মূল্যই তাহার নাই। আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেহের সুগৌর বর্ণই হউক, ঘন ভ্রূযুক্ত কৃষ্ণতার আয়তনেত্রের অর্দ্ধনিমীলিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিই হউক, তাম্বূলরাগরঞ্জিত পাতলা ঠোঁটের শ্রীযুক্ত টানই হউক, এক কথায় নিখুঁত মুখের সঙ্গে নিটোল স্বাস্থ্যভরা দেহের অপরূপ লাবণ্য—এ দেহের যাহা-কিছু সৌন্দর্য্য—সমস্তই বৃথা। তটপরিপ্লাবী জলভরা নদী যদি সমুদ্রগামিনী না হইল তো বৃথাই তাহার পরিপূর্ণতা। কি হইবে মায়ের কোলে ফিরিয়া! এই অবর্ণনীয় দুঃখ-ব্যথার ইতিহাস কাহারও কাছে যে ব্যক্ত করিবার নহে। সৌভাগ্যবতীরা মুখে দিবেন সহানুভূতি, অন্তরে থাকিবে অহঙ্কার। যে গৌরব বহিয়া প্রফুল্লমুখী বধূ বাবা মায়ের কাছে নববিকশিত ফুলের মত ফিরিয়া আসে, চাঁপার সে গৌরব কোথায়? সে কিছুতেই সেখানে যাইবে না। কেন যাইবে—শুধু কাঁদিতে, করুণা কুড়াইতে, মুখ শুকাইয়া মায়ের আঁচলের তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতে?

কিন্তু কঠোর অবনীনাথ, ততোধিক কঠোর তাঁহার আদেশ। বিবাহের পর যে নিয়ম তিনি বাঁধিয়াছিলেন, আজ সে নিয়মের ব্যতিক্রম তাঁহারই ইচ্ছায় হইতেছে। এই সুবিশাল প্রাসাদে এমন কেহ নাই, যিনি বিধিলিপির মত অলঙ্ঘ্য এই আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করেন। অবাধ্যতার ফল লোকের উপহাস কুড়ানো। অথচ চাঁপা জানে, এই যাওয়াই তাহার জন্মের মত যাওয়া। সীতার মত নির্ব্বাসনে সে চলিল। সীতার মতই সেই চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ে তাহার জীবনের যবনিকা নামিয়া আসিবে।

হু হু করিয়া দুই চোখে অশ্রু নামিল। যুক্তকরে দেয়াল-বিলম্বিত সুজাতার আলেখ্যের পানে চাহিয়া কোন প্রার্থনার বাণীই সে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

প্রাসাদের কোণের ঘর হইতে নদী দেখা যায়। নদীতে জমিদার-বাড়ির সেরা নৌকাখানি সাজানো হইতেছে। ফুল দিয়া, পতাকা দিয়া, রঙীন কাপড় ঘিরিয়া, মানসম্ভ্রমগৌরবের আয়োজনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া নৌকার সজ্জা হইতেছে। অনুকূল বায়ুতে মৃদু তরঙ্গাঘাতে নৌকা যখন নাচিয়া চলিবে, কূলে কূলে বিস্ময়ব্যাকুল দৃষ্টি মেলিয়া কত আবালবৃদ্ধবনিতাই না চাহিয়া রহিবে। চোখে মুখে তাহাদের কি সে সম্ভ্রম! কত লোক এই সৌভাগ্যকে হিংসা করিবে, কত লোক বলিবে, কপাল! শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের অবগুণ্ঠনে শ্রেষ্ঠতম অভাগ্যের কাহিনী কেহই জানিবে না।

সকলের অনুরোধে মুখে কিছু দিতে হইল, চোখের জলও চাপিয়া রাখিতে হইল।

মেয়ে বাপের বাড়ি যাইবে হাসিমুখে—বাঙালী ঘরে এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোথাও নাই। হাসি না আসিলেও সহজভাবেই চাঁপা

প্রণাম বা বিদায় সম্ভাষণ শেষ করিল এবং ধীরপদে গিয়া নৌকায় উঠিল। অবনীনাথ নৌকার সন্নিকটে ছিলেন না, চাঁপাও কোন দিকে চাহে নাই। নৌকা ছাড়িতেই সে উপুড় হইয়া পড়িল। তারপর নদীজলের সঙ্গে নয়নজল মিশিলেও সে দুর্ব্বলতার বা অবমাননার সাক্ষী কেহ নাই বলিয়াই চাঁপা তেমনই নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল।

অবনীনাথের শরীর ভাল ছিল না বলিয়া নামমাত্র আহারে বসিয়া বহুদিন পরে আপনার শয়নকক্ষে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন। শয্যায় শুইয়া সুজাতার আলেখ্যের পানে চাহিয়া মন অনেকটা হালকা হইয়া গেল। রাত্রির দুর্ব্বলতা তিনি কঠোরভাবেই দমন করিয়াছেন। সুজাতাকে ঢাকিতে যে মেঘ ছায়া ও শীতল জলধারা লইয়া দেখা দিয়াছিল, অবনীনাথ ফুৎকারে তাহা উড়াইয়া দিয়াছেন। মনের কোথাও বাসনার বিষবৃক্ষ নাই, আছ কেবল তুমি—তুমি সুজাতা—পরিপূর্ণ দিনের আলোয় সমস্ত অন্তর ব্যাপ্ত করিয়া।

সুজাতার স্মৃতি ধ্যান করিতেই যেন অবনীনাথ চক্ষু মুদিলেন। অমনই সেই হাস্যমুখে বিষাদের রেখা ফুটিল, ভাসন্ত চোখ দুইটিতে জলবিন্দু পতনোন্মুখ হইল, মূর্চ্ছাহতের মত সুজাতা ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। সান্ত্বনা দিতে গিয়া অবনীনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। এ কাহার মুখ? এ যে সেবারূপিণী চাঁপা তাঁহারই রূঢ় বাক্যে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছে।

সভয়ে তিনি চক্ষু চহিলেন। না, সুজাতা তেমনই হাসিতেছে। চাঁপা তো রাত্রির দুঃস্বপ্ন, সুজাতার হাসির আলোয় সে কি তিষ্ঠিতে পারে? কিন্তু ঐ আলনায়-খয়ের পাড়ের কাপড় ও ফুলকাটা সেমিজ

ঝুলিতেছে, আয়নার ফ্রেমে অল্প একটু চূণ লাগিয়া আছে, আলমারিটায় নূতন বিবাহের যৌতুক থরে থরে সাজানো। এমন কি, জানালার ধারের মেঝেটুকু, চাঁপা যেখানে দ্বিপ্রহরে ডাহুকের ডাক শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত, সেখানটা বেশ চকচকে। এত অল্প দিনে ঘরখানিতে বহু চিহ্নই সে রাখিয়া গিয়াছে। কতক সরাইলে বা মুছিলে দূর হয়, কতক বা স্থায়ী।

সেই সঙ্গে বালিকার নেপথ্যের আয়োজন মনে পড়িতেছে। ত্রস্তা হরিণীর মত তাহার দ্রুত পলায়ন, অথচ সেবা দিবার সে কি আকুলতা! উঃ সুজাতা, কি নিষ্ঠুর তুমি! বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া দূরেই সরিতেছ! তোমার সুদীর্ঘ আটটি বৎসর এই কুটিল বালিকা স্বল্প একটি বৎসরে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। তুমি আনন্দ দিয়া কত মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বল করিয়াছিলে, এ অশ্রুভারনেত্রে বিষণ্ণ মুখে সামান্য কয়টি মুহূর্ত্তকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে। তোমার আনন্দের অক্ষয় পরমায়ু ইহার বিষণ্ণ দৃষ্টিতলে নিভিয়া যায় কেন? তোমার প্রতি অগাধ ভালবাসা ইহাকে দেখিয়া সমবেদনার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে যে!

দিনে দিনে অবনীনাথ অস্থির হইয়া উঠিলেন। সুজাতার স্মৃতি যত প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিতে চান, চাঁপার বেদনা-মলিন মুখের ছায়া ততই সে স্মৃতিমুকুরে উঁকি মারে। রাত্রিতে সুজাতা আসিয়া সেবা করে; কখনও হাসিয়া, কখনও বা অশ্রুমুখী।

কেবলই মনে হয়, বালিকার কি দোষ? একের অপরাধে অন্যকে এ গুরু শাস্তি দিবার কি প্রয়োজনই বা ছিল? পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ মন হুঙ্কার দিয়া উঠে, ছিল বইকি, ষড়যন্ত্র করিয়া যাহারা সুজাতাকে কাড়িয়া লইয়াছে তাহারা হাসিমুখে ফিরিবে? না, তাহাদেরও বুকে আগুন জ্বলুক, দাহনের জ্বালা তাহারাও বুঝুক।

আবার তিনি মহাল পরিদর্শনে বাহির হইলেন। এক মাস, দুই মাস, চার মাস গেল। অবনীনাথ ফিরিবার নাম করেন না। যতক্ষণ হট্টগোলে কাটিয়া যায় ততক্ষণ তিনি ভাল থাকেন, সন্ধ্যা হইলেই বুকে কাঁপন লাগে। ঐ বুঝি রাত্রির পক্ষপুটে ভর করিয়া সুজাতা আসিল, পিছনে বিষণ্ণ বধূ চাঁপা। সারারাত্রি—কি জাগ্রতে, কি স্বপ্নে—ইহাদেরই অভিযোগ-অনুরাগ চলিবে। কাহাকে ভালবাসিয়া স্বর্গ পাইয়াছেন, কাহাকে বিবাহ করিয়া ভুল করিয়াছেন, কাহার হাসিতে বুক ভরিয়া উঠে, কাহার চাপাকান্নায় অনুতাপের আগুন জ্বলে! একবার বিবেক, একবার প্রতিশোধস্পৃহা শরতের মেঘ-রৌদ্রের মতই দেখা দেয়। সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াও অবনীনাথ সে বিচারের শেষ করিতে পারেন না।

এমনই করিয়া কয়েক মাস কাটিলে অবনীনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। মহালে ভাল ডাক্তারই ছিল। কয়েক দিন চিকিৎসার পর তিনি বলিলেন, অসুখ শক্ত, সময় নেবে।

শুনিয়া অবনীনাথ আকুল হইয়া উঠিলেন। নায়েবকে হুকুম দিলেন, যেমন করিয়া হউক আমাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দাও। আর এক দণ্ডও এখানে নহে।

মনে মনে বলিলেন, শেষ নিশ্বাস ফেলিতে হয়, সেই ঘরে গিয়াই ফেলিব, যে ঘরে সুজাতার ছবি হাসিতেছে, যে বাড়িতে সুজাতার স্মৃতি লক্ষ বাহু বাড়াইয়া সাদর আহ্বান জানাইতেছে। সেই নদীর ধারে তেমনই একটি অগ্নিজিহ্ব চিতা জ্বলিবে, জলের বুক উজ্জ্বল করিয়া অবনীনাথ ছাই হইয়া যাইবেন।

প্রভুর সেবার জন্য দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন সকলেই তৎপর হইল; অবনীনাথ তৃপ্ত হইলেন না। এ কি সেবা! আহার নিদ্রা এবং সাংসারিক সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া যে যাহার অবসরমুহূর্ত্তে আসিয়া বসিতেছে। কোথায় ইহার চেয়েও দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়া কে কত দিন ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছিল, দৈবপ্রাপ্ত ঔষধের মহিমা —সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ সুখ-দুঃখের কাহিনী। অবনীনাথ উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছেন। এই মুখের সহানুভূতি, প্রাণহীন করের যান্ত্রিক সঞ্চালন, অভয়হীন সরব সান্ত্বনা—কতক্ষণ আর সহ্য করা যায়!

মৌনময়ী রাত্রির অর্দ্ধযামে ধ্যানরতা শুদ্ধাচারিণী বালা দুইটি কোমল করপল্লবে সারা দেহে নীরবে যে অভয় বা সান্ত্বনা দিয়াছে তাহার মূল্য কৃতজ্ঞতা দিয়া নিরূপণ করা চলে না। সেবার সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ আবেশ সারা দেহকে আরাম ও অবসন্নতায় ভরিয়া সুমধুর নিদ্রার রাজত্বে টানিয়া লইয়া যায়। মৃদু করচালনায় প্রাণের স্পর্শ নিবিড় করিয়াই পাওয়া যায়।—যে জিনিস সুজাতার ছিল, চাঁপারও আছে; বাহিরের শত অসামঞ্জস্যের মধ্যেও সুজাতা ও চাঁপার কোন প্রভেদই তো নাই। নাই থাকিল বিদ্যার ঔজ্জ্বল্য, বুদ্ধির দীপ্তি; সর্ব্বক্ষণের সহচরী হইবার যোগ্যতাও হয়তো নাই, তবু সেবার দিক দিয়া হৃদয়বৃত্তিতে সুজাতার চেয়ে চাঁপা কম মহিয়সী নহে। চাঁপা যেন বাংলা দেশের নিরাবরণ প্রকৃতির একটা অংশ। মুক্ত বায়ু, প্রচুর আলো ও দূর্ব্বাসম্পদভরা শ্যামল মাঠ তাহার নিজস্ব সম্পদ। গ্রীষ্মের প্রভাতে ও অপরাহ্নে অপূর্ব্ব, বর্ষায় ঘনশ্যামল এবং শীত শরতের দিনেও দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিবার সঞ্চয় তাহার প্রচুরতর। বসন্তের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কেন না সে শুভদিনের সমারোহ এই শুষ্ক মালঞ্চে নাও আসিতে পারে।

কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে এমন অনাত্মীয় শুষ্ক সেবা লইয়া তিনি মরিবেন

না। সুজাতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি তুচ্ছ পৃথিবীর প্রত্যহের গ্লানি, ক্ষোভ বা ক্রোধের ধূম সঞ্চিত করিয়া মালিন্য আনিবেন না। সমস্ত পৃথিবীর উপর তাঁহার প্রসন্নতা জাগিয়া উঠিতেছে। অনায়াসে অক্লেশে তিনি দ্বারিককে ক্ষমা করিবেন, চাঁপার অধিকার ফিরাইয়া দিবেন।

দেওয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কি তিথি?

দেওয়ান উত্তর দিল, ত্রয়োদশী।

অবনীনাথ বলিলেন, নৌকা সাজাও, চন্দনী মহালে যেতে হবে। তোমাদের রাণীজী আসবেন।

আনন্দে দেওয়ান বলিল, এই বিকেলেই নৌকা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

একটু থামিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু আজ ব'লে গেছেন, আপনি ভাল হয়ে উঠবেন।

অবনীনাথ বিমর্ষ হইয়া সুজাতার আলেখ্যের পানে চাহিলেন। তবে কি তিনি রহিয়া গেলেন? নদীর তীরে চিতা জ্বলিবে না? মুক্তির আলোয় সুজাতাকে ফিরিয়া পাইবেন না?

সুজাতা হাসিতেছে। সমস্ত অন্তরের মাধুর্য্য ও সারল্য সে হাসিতে উপচিয়া পড়িতেছে। যেন বলিতেছে, আমি তো মরি নাই; নারী মরে না। ভালবাসিয়া যে তোমার নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছে, সে আমিই। বাহির লইয়া বিচার করিও না, অন্তরের প্রতি মনোযোগ ও। দেখিবে নবকলেবরে তোমারই হৃদয়-সহকারে আমি মুঞ্জরিত ধবীলতা। আমি ছাড়া তোমাকে কে আর তেমন ভালবাসিতে ারে? সুতরাং সমগ্র অন্তর দিয়া যে তোমাকে প্রার্থনা করিতেছে, আমিই।

অবনীনাথের সংশয় কাটিয়া গেল; আনন্দপরিপূর্ণ দৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিলেন।

ত্রয়োদশীর চন্দ্র আকাশে হাসিতেছে। বাঁশঝাড়ের বক্ররেখায় আলোর ফুলকি, ঝোপে ঝোপে আলোর বন্যা। পুকুরের স্নিগ্ধ জল জ্যোৎস্নায় মণির মত চিকচিক করিয়া জ্বলিতেছে।

তিনি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন, কাল নৌকা লোকনাথপুরে পৌছিবে, পরশু চাঁপা আসিবে। সেদিন কি তিথি— কি তিথি?

মৃদু হাসির দীপ্তিতে মুখ ভরিয়া উঠিল। মনে মনে তিনি উচ্চারণ করিলেন, সেদিন পূর্ণিমা।

কুজ্ঝটিকা ও কিরণ

বেলার বিবাহে মিত্র-বংশের যে যেখানে ছিলেন আসিয়া জড় হইলেন। খুড়তুত, জাঠতুত, মাসতুত, পিসতুত ছাড়া বেলার বাপেরাই সাত ভাই বর্ত্তমান। ভগিনী ছয়টি।

জন্মপল্লীতে সেই জীর্ণ বাড়িখানি সংস্কার অভাবে সুদূর অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠাখানি মেলিয়া ভাবী বংশধরদের পানে করুণ নয়নে চাহিয়া আছে। অতটুকু বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ও পল্লীর সহস্র কল্পিত অকল্পিত অসুবিধার মধ্যে চাকুরিয়ার জীবনকে দুই এক দিনের জন্যও দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত করিবার আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, কেহই সেই ভগ্ন জন্মভিটার মমতাময় চাহনিটুকু দেখিয়াও দেখেন নাই। বিলীন অতীত বিস্মৃতিতে ডুবিয়াছে, সোনার বর্ত্তমান স্ত্রীপুত্রপরিজনের সাহচর্য্যে সুখেই কাটিয়া যাইতেছে। ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ইঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। কেহ বা হিমালয়ের শিরোদেশে, কেহ বা কুমারিকার প্রান্তসীমায়; পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র—সর্ব্বত্রই এই অভিজাত বংশীয়ের চরণচিহ্নে চিহ্নিত।

অনন্ত শূন্যে ঘূর্ণ্যমান গ্রহতারারা যেমন স্ব স্ব গতিপথে প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইবার সময় সহসা এক একবার অতি-নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে ও পরস্পরের জ্যোতিরেখার সংঘর্ষে উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত করিয়া

জানাইয়া দেয়, তাহারা সমধর্ম্মী বা সমজাতীয়, তেমনই এই হিমালয়-কুমারিকাপ্রান্তবাসীবর্গ কখনও কেহ কাহারও সম্মুখবর্ত্তী হইলে আদর-আপ্যায়নে পরস্পরকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বুঝাইয়া দেন—বংশপরম্পরায় উঁহাদের ধমনিতে একই শোণিত প্রবাহিত। সে যাহাই হউক, বেলার পিতা মণিমোহন মোটা মাহিনার চাকুরি করেন, একজন নামজাদা অফিসার তিনি। সম্মান ও অর্থ দুইই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার মনে রক্তের সম্বন্ধটা এতকাল পরে বেলার বিবাহে সহসা জাগিয়া উঠিল এবং বেশ একটু গভীর আন্দোলনেরই সৃষ্টি করিল।

অসংখ্য সম্বন্ধ সূত্রের ন্যায় ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উর্ণনাভের জাল বিস্তার করিয়াছে; তিনি দৃঢ় করে তাহা টানিয়া তুলিবার প্রয়াস করিলেন। নিমন্ত্রণপত্র গেল, অর্থ প্রেরিত হইল, লোক ছুটিল। সমগ্র ভারতবর্ষ কলিকাতার ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইল।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ। অসংখ্য কক্ষে অগণ্য আলোক জ্বলিতেছে এবং আগন্তুকগণের কোলাহলে সে স্থান মুখরিত।

সকলেই নিকট-আত্মীয়, সকলেই অভ্যাগত। দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদের পর মিলনের ব্যগ্রতাটুকু কাহারও নয়নে বা অন্তরে রেখাপাত করে নাই। দশজন নিঃসম্পর্কীয় পরিবার ট্রেনে বা ষ্টীমারে যেমন কয়েক ঘণ্টার জন্য একত্র মিলিয়া মুহূর্ত্তের তরে সাংসারিক পরিচয় ও সুখ-দুঃখের সংবাদ লইয়া থাকে এবং গন্তব্যস্থানে আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের পরিচয় বিস্মৃত হইয়া আপন আপন পৌটলা-পুঁটলি লইয়া মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যায়, উঁহাদের অন্তরেও নিকটতম আত্মীয়ের সুখ-দুঃখের স্পর্শ অমনই নির্লিপ্ততার অনাসক্তিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই বিবাহ মিলনের উপলক্ষ মাত্র, কয়েক দিনের বিদেশবাস। যে যাহার পুত্রপৌত্রের

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই বিভোর। ইহাদের বিলাইয়া যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা লইয়া যত কিছু আত্মীয়তার শিষ্টাচার। প্রিয়পরিজনের সুখ-স্বার্থের প্রাচীর-পার্শ্বে, তাই এই আত্মীয়-বন্ধুর পরিচয়ের এতটুকু শীত-সঙ্কুচিত কিরণ আসিয়া জমিয়াছে। গৃহলক্ষ্মীরা যে যাহার পুত্রকন্যা লইয়া এক একখানি কক্ষ দখল করিয়া বাক্স পেটরা বিছানা গুছাইয়া অপর কক্ষের সংবাদ সংগ্রহে তৎপর। বাহিরে ঠাকুর, চাকর—কাজকর্ম্ম রন্ধন-আয়োজনের ভার লইয়াছে। অর্থের অপ্রতুলতা নাই, কার্য্যে বিশৃঙ্খলারও অভিযোগ নাই। জিনিস আসিতেছে প্রচুর, খরচ হইতেছে অজস্র এবং অপচয় হইতেছে তাহার চতুর্গুণ। বৃহৎ বটবৃক্ষের অসংখ্য শাখায় শুধু রাত্রিযাপনের মানসে নানা দিগ্‌দেশ হইতে দলে দলে পক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে; কলরব উঠিয়াছে বিচিত্র। ইহাকে আনন্দ বলিতে চাও—বল, জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বলিতে চাও—আপত্তি নাই, কিন্তু দোহাই, কামনার শ্রেষ্ঠত্ব যেন আরোপ করিয়া বসিও না। আত্মীয়তার দোহাই দিয়া এত বড় আত্ম-প্রতারণা জগতে আর আছে কিনা সন্দেহ।

বরণের সময় কুলা, ডালা, শ্রী কিছুই মিলিল না। বেলার মা অসহায়নেত্রে সমাগত জনমণ্ডলীর পানে চাহিলেন।

মেজদিদি বলিলেন, আ আমার কপাল! বড়দি যে জোগাড় করেছিলেন সব। এস দেখি।

বহুকষ্টে বড়দিদির সন্ধান মিলিল। বাটির প্রান্তসীমায় তিনি এক বৃহৎ হলে কুড়ি-পঁচিশটি কুটুম্বিনীর মধ্যস্থলে বসিয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া কি বলিতেছিলেন, আর সমাগত মহিলারা উচ্ছ্বসিত হাসির বেগে পরস্পরের স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িয়া কক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই রস উপভোগ করিতেছিলেন।

মেজভাইয়ের স্ত্রী রেণুকার কৌতূহলটাই কিছু বেশি। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, তারপর বড়দি, কচুরি খেয়ে চাষা কি বললে?

বড়দি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, চাষা অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে চাষানীর কাছে এসে বললে, হ্যা দেখ নেপলার মা, রামুনবাড়ি যা খেয়ে এলাম তার তুলনা নেই। কি ক'রে এমন ধারা করেলো বল দিকি? চাষানী অনেক ভেবেচিন্তে বললে, বোধ হয় কলুই আর গম একসাথে বুনেছেল!

সকলে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেজদিদির আর কুলা-ডালার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। হাসিতে হাসিতে বড়দিদির কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, সেই থাকমণির মোহনভোগের গল্পটা বড়দি!

বড়দিদি তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন, আর পারি না বাপু। এইমাত্তর সে গল্প হয়ে গেল।

মেজদিদি অনুনয় করিলেন, তা হোক। আর একবার, দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি!

বড়দিদি বলিলেন, গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল! ওলো ছাড় এখন। বর এসেছে, একবার দেখি গে।

মেজদিদি বলিলেন, যে ভিড় সেখানে, কোথায় যাবে? তার চেয়ে গল্প বল, শুনি।

বড়দিদি আরম্ভ করিলেন,—

কৈবর্ত্তদের মেয়ে থাকমণি অল্প বয়সে বিধবা হয়। সংসারে তার বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। হাতে কিছু নগদ টাকা ছিল, আর দুঃখ-ধান্দা ক'রে দিন চালাত। একদিন একাদশীতে আমার কাছে এসে বললে, আর শুনেছ দিদিঠাকরুণ, কাল দশমীতে কি অমত্তই খেলাম। আহা, যেন স্বগগের সুধা!

জিজ্ঞাসা করলুম, কি লা, কি খেয়েছিলি? থাকোর চোখ দুটো চকচক ক'রে উঠল, জিভটা অল্প একটু বেরিয়ে এল, মুখে একটা শব্দ ক'রে বললে, অমত্ত গো দিদিঠাকরুণ, অমত্ত। তোমাদের বুড়োগিন্নি বলেছেল, আসছে দশুমীতে ক'রে খাস থাকো। আহা, কি খেলাম, কি খেলাম!

যতই জিজ্ঞাসা করি, কি? থাক ততই গুণ-বর্ণনায় পঞ্চমুখ; নামটি আর কিছুতেই মুখে আনে না। শেষে রাগ ক'রে বললুম, এক ঘণ্টা ধ'রে তো কেবল কি খেলুম, কি খেলুমই করছিস; যদি নামটা বলতিস তো আমরাও না হয় একটু পরক ক'রে দেখতুম। যাই বলা, অমনই থাক তাড়াতাড়ি বললে, মোহনভোগ গো দিদিঠাকরুণ, মোহনভোগ। খেতে রাজভোগ, অল্প পয়সায় বড়মানুষী খোরাক। মাথা খাও, আর-দশুমীতে ক'রে খেও।

অবাক হয়ে বললুম, মোহনভোগ কি লা থাকি? সে আবার কেমন ক'রে করতে হয়?

থাক জেঁকে ব'সে বললে, তবে শোন দিদিঠাকরুণ। এক পয়সার সুজি, এক পয়সার ঘি, আর আধ পয়সার চিনি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে মাকে বললাম, উনুন জ্বাল। দাউ দাউ ক'রে উনুন জ্বলে উঠল। বললাম, চাপা কড়া। কড়া চাপল। তারপর, বললে না পেত্যয় যাবে দিদিঠাকরুণ, সেই এক পয়সার ঘি সবখানি হুড়হুড় ক'রে দিলাম ঢেলে কড়ায়। ঘি যখন কলকল ক'রে উঠল, তখন সুজি ঢেলে খুন্তি দিয়ে নাড়তে লাগলাম। বেশ লাল লাল ভাজা ভাজা হয়ে এল যখন, পাশে ছিল বড় ঘটির এক ঘটি জল, দিলাম ঢেলে সবটা। তারপর খুন্তি দিয়ে কেবল নাড়তে লাগলাম। বলব কি দিদিঠাকরুণ, নাড়তে নাড়তে নাড়তে হাতের নড়া ছিঁড়ে যাবার

জো। এমন সময় মা দিলে চিনি ঢেলে। আবার নাড়তে লাগলাম। নাড়তে নাড়তে যেই ঘন ফুট ধরেছে, অমনই কড়াখানা উন্থন থেকে নামিয়ে নিলাম। মস্ত একটা পাথরের খোরা ছিল ঘরে. সেই মোহন-ভোগ—আহা দিদিঠাকরুণ, কি যে তার রূপ—ঢাললাম সেই খোরায়। হ'ল এক খোরা। তারপর? মুখে দিই · আর নেই, মুখে দিই আর নেই। নাম মোহনভোগ, খেতে রাজভোগ, অল্প পয়সায় বড়মানুষী খোরাক। মাথা খাও দিদিঠাকরুণ, আর-দশমীতে ক'রে খেও।

সকলে হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বড়দিদি উঠিয়া বলিলেন, আর নয়। চ জামাই দেখি গে, নইলে বড়বউ আবার কি মনে করবে।

কলরব করিতে করিতে মেয়েরা উঠিলেন।

কথায় বলে, লোকবল—বড় বল।

কিন্তু জামাই-বরণের বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কার্য্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া বড়বধূ ভাবিলেন, এমন বল যেন অতি বড় শত্রুরও না থাকে। কথায় কথায় ক্রোধ দেখাইয়া মানের বোঝাটা অতিরিক্ত রকমে ভারী করিয়া প্রত্যেকে প্রতি পদক্ষেপটি হিসাব করিয়া ফেলিতেছে। স্বামী নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, স্ত্রী করজোড়ে গলবস্ত্রে ত্রুটি সারিতে সারিতে প্রাণান্ত হইতেছেন। তথাপি কি মন উঠে!

ওই সিঁড়ির কাছে প্রথম ঘরখানিতে নাতিনাতিনী লইয়া বড়দিদি আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি সকলের জ্যেষ্ঠা—মাতৃস্থানীয়া। পুত্র নাই, কন্যাও সবেমাত্র একটি ছিল; কয়েক বৎসর হইল মায়ের খর রসনা-সঞ্চালনের ফলে আত্মঘাতিনী হইয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে। নাতিনাতিনী

লইয়া তাঁহার সংসার। বিধবা মানুষ, মাঝে মাঝে কাশী বৃন্দাবন বাসের হুমকি দিয়া ইহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলেন, কিন্তু সে ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণে মাত্র। তুফান থামিলে হাসিয়া খেলিয়া গল্প করিয়া ছেলে-মেয়ে ঠেঙাইয়া দিনগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দেন। একটা স্বতন্ত্র রান্নাঘর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিধবার আয়োজন ম্লেচ্ছপনার মধ্যে তো চলিতে পারে না।

পাশের ঘরখানিতে থাকেন নবউ উমাতারা। স্বামী কাবুল-সীমান্তে কমিসরিয়েটে মোটা মাহিনার চাকুরি করেন। স্ত্রীর অলঙ্কার-পারিপাট্য দেখিলে সে সচ্ছলতার অনেকখানি অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। দুই পুত্র, কন্যা নাই। সুতরাং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সংসার-তরণীতে দোলা খাইতেছেন।

সেজবউ যদিও তাহার পাশের ঘরখানি পাইয়াছে তথাপি সে যেন আর একটু দূরে থাকিলেই ভাল দেখাইত। স্বামীর চাকুরি সামান্য, কোন আপিসের আশি টাকা মাহিনার কেরানি সে। স্ত্রীর কোলভর্ত্তি পুত্রকন্যা, প্রবল বন্যার মত না হইলেও সংখ্যায় নিতান্ত মন্দ নহে। হাতে শাঁখা ও রুলি, পরণে বঙ্গলক্ষ্মী-শাড়ি। বিবাহ উপলক্ষে বহু-কালের পুরানো ভাঁজ-করা শান্তিপুরী শাড়িখানি বাহির হইয়াছে, আর বাহির হইয়াছে শাশুড়ীর দেওয়া পুরানো অনন্তগাছি। অবশ্য এ সবের চলন এখন আর নাই। উপর-হাতের গহনা আড়াইপেঁচ তাগায় আসিয়া ঠেকিয়াছে; অতি-আধুনিক ফ্যাশানে তাহারও স্থান নাই। সেজবউ কেরানির স্ত্রী, তাহার এসব আধুনিকত্বের খোঁজখবর লইতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। তাই কর্ম্মবাড়িতে ঘষিয়া-মাজিয়া পুরাতন জিনিসগুলিকেই সজ্জার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

পাশেই সেজঠাকুরঝির বিবিয়ানা, ফ্যাশানের সাজসজ্জা তাহার

দারিদ্র্যকে যেন শতকণ্ঠে উপহাস করিতেছে। সেজবোনের স্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কোথাও অন্নজলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। দুই মাস ছয় মাস করিয়া বাংলা দেশের সমস্ত স্থানের জলবায়ু চাখিয়া চাখিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি সাহেব-ঘেঁষা বলিয়া স্ত্রীরও পর্দ্দার বালাই নাই। স্বামীর সঙ্গে মোটরে চড়িয়া, টেনিস খেলিয়া, টি-পার্টি, ডিনার-পার্টিতে যোগ দিয়া দিনগুলি বেশ লঘু স্বচ্ছন্দভাবেই উড়াইয়া দেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি চকলেট বিস্কুট চাখিয়া, ঘাড় কামাইয়া খাট চুল রাখিয়া, হাঁটুর উপর স্কার্ট ঝুলাইয়া প্রজাপতির মত বিচিত্র ছন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য হইলেও ফ্যাশানে কেতা-দুরস্ত। বড় বড় পার্টিতে সেজদিদি কয়েকবার ফ্যান্সি ড্রেসের পুরস্কার পাইয়াছেন।

বৈষম্যই বোধ হয় জগতের বৈশিষ্ট্য। তাহার পাশের ঘরেই পুরাদস্তুর হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া মেজদিদি স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ অবস্থিতি করিতেছেন। স্বামী ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ছিলেন; উপস্থিত অবসর লইয়া সঞ্চিত ক্যাশের তত্ত্ব লইতেছেন। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে নিজস্ব বাটি করিয়াছেন। একমাত্র পুত্র। সেও সম্প্রতি তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যাঙ্কের একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সাংসারিক আয়ের কিছুমাত্র সচ্ছলতা হয় না। ছেলের পান-সিগারেট-চা-চপেই ঐ টাকাটা খরচ হইয়া যায়। মেজদিদি সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নহেন। নিজ বসতবাড়িরই একাংশ জনৈক মান্দ্রাজবাসীকে চড়া হারে ভাড়া দিয়াছেন, বলেন, এই বাড়িই আমার রোজগেরে ছেলে। কথাটা সত্য। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কের কল্যাণে মোটা সুদের টাকাটা সংসারের আয়ব্যয় সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই তাঁহাকে অভয়বাণী শুনাইয়া আসিতেছে। মানুষটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে

দশাসই। গায়ে গহনাও খুব বেশি নাই; তবে তাগা, বালা, হার ও চুড়ি লইয়া সর্ব্বসুদ্ধ সের-পাঁচেক সোনা তাঁহার অঙ্গে চাপানো রহিয়াছে। পরনে গরদের শাড়ি, দেখিলে বোধ হয় বনিয়াদী চাল।

তার পরের ঘরখানিতে থাকেন মেজভাইয়ের স্ত্রী। ভাই পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর, ছুটি পান নাই। স্ত্রী তাঁহার ছয়টি কন্যা ও একটি পুত্রসহ বৃহৎ সমুদ্রের স্রোতে মিলিতে আসিয়াছেন। গৃহস্থ মানুষ, পুলিসের চাকরি করেন। স্ত্রীর অষ্ট অঙ্গে অলঙ্কারের অপ্রতুল নাই। তবে প্যাটার্নগুলি মিশ্রিত, সেকাল ও একালের সমন্বয় বজায় রাখিয়াছেন। হিসাবী লোক বলিয়া বারে বারে বানির টাকাটা খরচ করিতে তিনি নারাজ। পুরাতন যাহা ছিল তাহার উপর নূতন তৈয়ারি হইয়াছে এবং এখানে আসিবার সময় স্ত্রীকে বারংবার বলিয়া দিয়াছেন—সদা-সর্ব্বদা সমস্ত অলঙ্কার ও ভাল ভাল জামাকাপড় পরিয়া যেন তিনি চারিদিকে আপনার স্বামীগর্ব্ব প্রচার করিতে কুণ্ঠিত না হন। তবে সাবধানও করিয়া দিয়াছেন, উহার একখানিও যেন অসাবধানে তাঁহার অঙ্গচ্যুত না হয়। স্বামীর রুক্ষ মেজাজের কথা স্ত্রী ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই নূতন পুরাতন সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া, মুহুর্মুহু শাড়ি বদল করিয়া স্ত্রীমহলে বেশ একটু কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছেন।

সম্মুখের সারিতে প্রথম কক্ষখানিতে নদিদির স্থান হইয়াছে। কক্ষটি ছোট, মানুষও তাঁহারা সবেমাত্র দুইটি। পুত্রকন্যা হয় নাই, হইবার বয়সও গিয়াছে। তথাপি স্বামী স্ত্রী কেহই অসুখী নহেন। পরের ছেলে দেখিলেই কোলে তুলিয়া আদর করেন, ভাল ভাল খেলনা কিনিয়া দিয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে যত্ন করেন। বোম্বাইয়ের কোন একটা মিলের ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ইঁহার স্বামী। নাসিকে বাড়ি কিনিয়াছেন। সময়ে সময়ে স্বামী স্ত্রী মিলিয়া ভারতের সমস্ত

তীর্থ পরিভ্রমণ করেন। অলঙ্কার বা বেশভূষার বাহুল্য নাই। স্থির সমুদ্রের জল অল্প বাতাসে বোধ হয় এমনই তরঙ্গহীন গাম্ভীর্য্যে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে।

ফুলদিদির স্বামী আসিয়াছেন, পুত্রকন্যারাও আসিয়াছে; তিনি নিজে আসিতে পারেন নাই। অন্তঃসত্বা বলিয়া ডাক্তার নাড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। পাশের ঘরখানি তাঁহার পুত্রকন্যারাই দখল করিয়াছে। স্বামী কণ্ট্রাক্টার, উপার্জ্জন নেহাৎ মন্দ করেন না।

তৃতীয় ঘরখানিতে আলমোরার প্রসিদ্ধ যক্ষ্মা-চিকিৎসক বিলাত-ফেরত ডাক্তার এ. এন. মিটার আশ্রয় লইয়াছেন। ইনি পঞ্চম ভ্রাতা। ডাক্তারীর আয়ে শৈলাবাসে জায়গাজমি কিনিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। বাংলা ভাষা না ভুলিলেও বাঙালী রীতি বিস্মৃত হইয়াছেন। ভুলিয়াও ধুতি পরেন না, আসনে বসিয়া ভোজন করেন না, বাবুচির রান্না ছাড়া মুখে তুলেন না। স্ত্রীর হিঁদুয়ানী প্রথম প্রথম একটু একটু ছিল। কিন্তু পাহাড়ে গোময় গঙ্গাজলের অভাবে সেটুকু বহুদিন হইতেই ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। একটিমাত্র কন্যা আঠারোয় পা দিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত কেহ বিবাহের নামগন্ধও উত্থাপন করেন নাই। সর্দ্দা বিল সম্বন্ধে ডাঃ মিটারের কি অভিমত ঠিক বুঝা না যাইলেও, বিবাহের বয়স যে আরও বৃদ্ধি করা উচিত তাহা তাঁহার আচরণ হইতে অনুমান করা যায়।

চতুর্থ ঘরে জব্বলপুরের সিনিয়র উকিল এল. এন. মিত্র বাস করিতেছেন। ইনি ষষ্ঠ ভ্রাতা। সরস্বতীর কৃপার আধিক্য থাকিলেও লক্ষ্মীর অনুগ্রহে ইনি বঞ্চিত। কোনক্রমে স্ত্রীপুত্র লইয়া বিদেশবাসের ব্যয়সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। হাতে উদ্বৃত্ত যাহা কিছু থাকে স্ত্রীর অলঙ্কার প্রসাধনেই ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে, তাঁহার আট দশ

বৎসরের পুরাতন চাপকান্‌, গরম স্থট, শামলা বনিয়াদী চাল বজায় রাখিলেও, বহুদূর হইতে মাত্র পশ্চাদ্ভাগ দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বলিতে পারে, ঐ রে নরেন উকিল যাচ্ছে। স্ত্রী নবীনকালী নব নব সখে মাতিয়া ও পুত্রকন্যাদের মাতাইয়া সদাসর্ব্বদা ইঁহার হাড় ও মাংস ভাজা ভাজা করিয়া থাকেন।

সপ্তম ভাই—সাত বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ ও ম্যাট্রিক ফেল—দুই কার্য্যই একযোগে সমাধা করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে সরিয়া পড়েন। বৎসর-খানেক কোন সাধুর আশ্রমে থাকিয়া যোগযাগ ভজনপূজনের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া গৃহীর শ্রেষ্ঠ যোগ কর্ম্মমার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পিতৃপিতামহের জমিজমার কিছু কিছু অংশ পাইয়াছিলেন, সাধুর আশ্রমে থাকিবার কালে কিছু মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, ছাইভস্ম ও শিকড় সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং অবসরমত বাংলা হ্যোমিওপ্যাথি পুস্তক কিনিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বও কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছেন। এখনও তিনি গেরুয়া পরেন নাই, ছাই না মাখিলেও মাথা রুক্ষ, চুলে জট ধরিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা বিলম্বিত, এবং চিত্ত-একাগ্রতার জন্য প্রত্যহ সকালসন্ধ্যায় ছোট্ট কলিকার ধূমপান করিয়া থাকেন। সুতরাং সংসারযন্ত্র তাঁহার নিকট অচল নহে। অমূর্ত্তের আলোক অনুসন্ধান করিলেও ইহলোক সম্বন্ধে মোটেই অচেতন নহেন। পাঁচটি পুত্রকন্যা প্রতিনিয়ত তাঁহাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখে। পঞ্চম ঘরখানিতে তিনি অস্থায়ী সংসার বাঁধিয়াছেন।

ষষ্ঠ ঘরে ছোট বোন কনকলতা বহুদূর হইতে আসিয়া বিশ্রাম লইতেছেন। সুদূর দক্ষিণে কোন দেশী রাজার অধীনে ইঁহার স্বামী চাকুরি করেন। একটি মাত্র পুত্র, বছরখানেকের হইয়াছে। মাকে মা ও বাবাকে বাবা ছাড়া আরও অনেক অস্পষ্ট ভাষা সে উচ্চারণ করিতে

শিখিয়াছে। তাহার অর্থবোধ লইয়া স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রত্যহ তর্কযুদ্ধ চলিয়া থাকে। খোকা হাসিয়া, হাত পা ছুঁড়িয়া, মায়ের মুখে ও বাপের গালে চুমা দিয়া সেই সব তর্কের সুমীমাংসা করিয়া দেয়। অর্থবান, স্বাস্থ্যবান এই দম্পতি ভালবাসার পথ ধরিয়া সুখস্বর্গের অভিমুখে চলিয়াছেন। অভাবের তীব্র তাড়না সে পথে কণ্টকগুল্মের বাধা জন্মাইয়া তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। প্রেমের স্পর্শ তাঁহাদের দুইটি হৃদয়ের পারাবারে চিরমিলনপূর্ণিমার আলোয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনস্বর্গে তাঁহারা সুরসম্রাট ইন্দ্র ও শচী।

উপরের ত্রিতল কক্ষে বড় ভাই মণিমোহন ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষগুলিতে খুড়তুত, জাঠতুত প্রভৃতি 'তুত' সম্পর্কীয়েরা আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহাদের বিস্তৃত ইতিহাস এই সবেরই পুনরুক্তি মাত্র। বাঙালী সংসারের অভাব-অনটন বা বিলাসবাহুল্য অথবা পরিমিত চাল-চলনের ভগ্নাংশ লইয়া ইঁহারা গঠিত। সকলেরই স্বামী পুত্র কন্যা পৌত্রের সমষ্টি-সীমায় এক একটি গণ্ডি ঘেরা। সংসার ঐ গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ।

বর-বিদায়ের দিন বাড়িতে খুব একটা হৈ চৈ উঠিল। মেজদিদি তাঁহার বিশাল বপু আন্দোলন করিয়া ও কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠ উচ্চগ্রামে তুলিয়া অতবড় বাড়িখানা দলিয়া চষিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শাপমন্যি, গালিগালাজ, শাসন-তিরস্কার, অনুনয়-বিনয়, ভয়-ক্রন্দন প্রভৃতি বিবিধ রসের বিস্তার করিয়া জানাইলেন, তাঁহার পুত্রবধূর গলার হার খোয়া গিয়াছে। কে লইয়াছে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, শুধু আত্মীয়তার খাতিরে এতক্ষণ পুলিস ডাকেন নাই। যদি না সে হার বাহির করিয়া দেয় তো চক্ষুলজ্জায় খাতির করিবেন না—একথাও প্রবল কণ্ঠে বারংবার জানাইয়া দিতেছেন। প্রথম সারির তৃতীয় কক্ষখানিই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির লক্ষ্যস্থল।

তাঁহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া মেজবউ বলিল, ওমা, কি ঘেন্না! কি প্রবৃত্তি গো!

ছোটবউ আশ্বাস দিয়া কহিল, ভয় কি মেজঠাকুরঝি, আমার ঘরে এস। উনি এখনই গুণে-গেঁথে ব'লে দেবেন, কোন্ চোরের কাজ এ।

অন্যান্য সকলে শতমুখে 'হায় হায়' করিতেছিলেন। ছোটবউয়ের কথা শুনিয়া যেন অকূলে কূল পাইলেন। একসঙ্গে প্রবল কলরব তুলিয়া কহিলেন, তাই চল গো, তাই চল। ছোটকর্ত্তা যখন সাধুসন্ন্যাসীর ঠেঁয়ে এমন বিদ্যেটা শিখে এসেছে, তখন পরখ করতে আপত্তি কি?

আপত্তি কাহারও ছিল না। অবিলম্বে ছোটকর্ত্তার ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

তিনি খড়ি পাতিয়া, মেজদিদির হাতের রেখা কচলাইয়া, দুই চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, সে আর শুনে কাজ নেই মেজদি।

মেজদি চক্ষু ঘুরাইয়া কহিলেন, তবু শুনি?

ছোটকর্ত্তা আবার ধ্যানস্থ, নির্ব্বাক। বহুক্ষণ অনুনয়-বিনয়ের পর কহিলেন, নাম আমি বলব না। তবে জেনে রাখ, এ তোমার আপনার লোকের কাজ।

মেজদিদি শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই বোমাফাটার মত শব্দমুখর হইয়া উঠিলেন, থাক, আর বলতে হবে না, আমি বুঝেছি।—বলিতে বলিতে একরূপ ছুটিয়াই তৃতীয় কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেজবউয়ের হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিলেন। এ্যাঁ, এত বড় আস্পদ্দা! আমার বোয়ের গয়নায় হাত!

ছোট পুত্রটিকে ঘুম পাড়াইয়া সেজবউ সবেমাত্র জলযোগ করিতে

বসিয়াছিল। মিষ্টিটায় একটা কামড় দিয়া জলের ঘটিটা এক হাতে তুলিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে এই প্রচণ্ড আকর্ষণ।

তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ ছাপাইয়া ভয়ার্ত্ত করুণ স্বর বাহির হইয়া পড়িল, মেজদি!

মেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, চোরের কান্না দেখে আর বাঁচি না! নে, ঢং রাখ, বার কর আমার হার।

সেজবউ গরিব কেরানির স্ত্রী। এতগুলি অতিথি-অভ্যাগতের মধ্যে তাহার অবস্থা শোচনীয়, সুতরাং চৌর্য্য যে একমাত্র তাহারই অপরাধ তাহা বলিতে ধনগর্ব্বিতার বাধিবে কেন? যদিও সেজবউয়ের ঘর মেজদিদির ঘরের পাশে নহে। তাঁহার দুই পার্শ্বের ঘরে সেজদিদি ও মেজবউ বাস করিতেছে। কিন্তু অবস্থা উভয়েরই উন্নত। একজনের স্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, অন্যের পুলিস ইন্‌স্পেক্টর। সন্দেহের সাধ্য কি তাহার ধার ঘেঁষিয়াও চলে! তাই ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে অপরাধী সেজবউকে দোষী সাব্যস্ত করিতে বড়মানুষ ননদের কিছুমাত্র বাধিল না। কারণ, সে আর যাহাই হউক—দরিদ্র।

সেজবউ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ঘুমন্ত পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি যদি নিয়ে থাকি মেজদি, তো একরাত্তির যেন—

কে পিছন হইতে আসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, থাম সেজবউদি, মা হয়ে অমন কঠিন দিব্যি ক'র না। পরে মেজদির পানে ফিরিয়া তেমনই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ছি ছি! তোমার লজ্জাও হ'ল না মেজদি, এই একবাড়ির লোকের সামনে সেজবউকে চোর ব'লে শাসন করতে? কি অপরাধ ওর? গরিব ব'লে কি ও মানুষ নয়, না মানসম্ভ্রম নেই?

সকলে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সদাহাস্যময়ী নদিদির মুখ বজ্রগর্ভ

মেঘের মত ভীষণ গম্ভীর। মেজদিদি ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। পরে সহসা লুপ্ত বিক্রম জাগাইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, বেশি বকিস নি শৈল, পুলিসে খবর দিলে দোষী নির্দ্দোষী এখনই টের পাওয়া যাবে, তা জানিস?

শৈল দমিল না, তেমনই নির্ভীক কণ্ঠে কহিল, দু দশ ভরি সোনার জন্যে যদি আত্মীয়স্বজনকে এমন লাঞ্ছিত করাই তোমার ইচ্ছে হয় মেজদি, বেশ, তাই কর। পুলিস ডাক—প্রমাণ হোক। কিন্তু এও ব'লে রাখছি, প্রমাণ করতে না পারলে তার পরের ব্যবস্থা আমিই করব, মনে রেখ।

জনতা মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। মেজদিদি উপযুক্ত জবাব পাইয়া মুখ এতটুকু করিয়া শাসাইতে শাসাইতে চলিয়া গেলেন, আচ্ছা দেখব, কার তেজ কতদূর গড়ায়! যদি পুলিস না ডাকি তো—ইত্যাদি।

কিন্তু তিনি পুলিস ডাকিলেন না, ডাকিলেন স্বামীকে, বলিলেন, আর একদণ্ড নয়, এ চোরের বাড়িতে থেকে আমার সর্ব্বস্ব খোয়াতে পারব না। ডাক গাড়ি।

নদিদি সেজবউয়ের মাথাটি সস্নেহে কোলে তুলিয়া বলিলেন, চুপ কর সেজবউদি, কেঁদ না। ওরা মানুষ নয়, চামার। কাল রাত্তিরে দেখলে তো একধামা লুচির জন্যে বড়দিদির কি অপমানটাই না করলে? তাঁর দোষ নাতিনাতনীদের একটু ভালবাসেন, মা-মরা ছেলেমেয়েগুলো। বাছারা খাবে ব'লে একধামা লুচি ঠাকুরের ঠেঁয়ে চেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে এনে রেখেছিলেন। ছোটবউ অনায়াসে বললে কিনা, বড়দি পরিবেশনের সময় সরিয়ে রেখেছে! ছি ছি! ইতরের মত ওরা সামান্য জিনিস নিয়ে কি ক'রে এমন লোক-হাসাহাসি করে, আমি তাই ভাবি!

আরও একটা দুঃসংবাদ অবিলম্বে প্রচার হইয়া পড়িল। জামাইয়ের হাতের হীরার আংটি পাওয়া যাইতেছে না। জামাই বাসরঘরে একবারমাত্র খুলিয়া বিছানার উপর রাখিয়া রাত্রিতে আহার করিতে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে আংটি নাই। নূতন জামাই, কেহ রহস্য করিয়াছে ভাবিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। প্রাতঃকালে বরের পিতা আসিয়া আংটির খোঁজ করাতেই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কৌতুক-পরিহাস গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

ছোটবউ আসিয়া বড়বউকে বলিল, বড়দি, যদি একবার ওঁর কাছে গুণিয়ে আসতে পার—

বড়বউ বাধা দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তাতে ফল কি ছোটবউ? যে নিয়েছে সে এই বাড়িরই লোক, আমাদের আত্মীয়। আমাদের জিনিস যদিই আমরা ফিরে পাই, তার লজ্জার অপমানটা ঢাকব কি দিয়ে? চোর যেই হোক, অপমানটা বিঁধবে গিয়ে আমাদেরই। লোকে বলবে, অমুকের অমুক এই কাজ করেছে। না ছোটবউ, মাথা হেঁট আমি করাব না, টাকার উপর দিয়ে যায় সে ভাল। উনি আংটি কিনে আনতে গেছেন।

নদিদি অদূরে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন। দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া বড়বউয়ের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন, মানুষ যে, সে এই কথাই বলে বড়বৌদি। ইচ্ছে করছে তোমায় পূজো করি।

পরে ছোটবউয়ের পানে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিলেন, আচ্ছা ছোটবউ, গণকেরা নিজের অদৃষ্ট গুণতে পারে না, নয়? তা হ'লে অনেক ব্যাপারই জানতে পারা যেত।

ছোটবউ মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া সহসা সক্রোধে বলিল, টাকার

গরমে তুমি ধরাখানা সরাখানা দেখ, না নদি? আমরা ঘাস খাই না, কিছু কিছু বুঝি।—বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কনকের স্বামী বলিল, সব দেখে শুনে মনে হয় কনক, আমরা বেশ আছি। আত্মীয়তার বালাই যার যত নেই, সে তত সুখী।

কনক কহিল, আত্মীয়-বান্ধব নিয়েই তো সমাজ। ওসব বজায় রাখতে গেলে কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করতেই হয়। নইলে গণ্ডি ঘিরে কেউ কখনও পরিপূর্ণ সুখটুকু পায় না।

খোকা তাহার গালের কাছে কচি মুখখানি আনিয়া ডাকিল, মা!

কনক তাহার অধরে চুম্বন আঁকিয়া দিতে দিতে হাসিয়া কহিল, কিন্তু এরা ডাকাত। একদণ্ডের এতটুকু সুখকে ত্যাগ করতে চায় না, জোর ক'রে আদায় করে।

কক্ষান্তরে ডাঃ মিটার তাঁহার পত্নীকে বলিতেছিলেন, দেখলে তো মিনু, বাঙালীর কুসংস্কার! এত অল্প বয়সে বিয়ে—

পত্নী কহিলেন, ওসব কথা এখন থাক। পরের বাড়িতে নাই বা করলে ওসব আলোচনা।

ডাঃ মিটার বলিলেন, বল কি মিনু? যা কুসংস্কার তার উচ্ছেদের জন্যে আমি চিরকাল প্রাণপণ ক'রে এসেছি, হ'লেই বা ভাইয়ের বাড়ি; বাঙালীদের এই কুসংস্কার—

পত্নী হাসিয়া বলিলেন, ওগো সায়েব মানুষ, থাম। তোমার ও গরম বক্তৃতা পরিপাক করবার মত শক্তি সকলের থাকে না। আর কি

করবে লেকচার দিয়ে? বিলেত ঘুরে সায়েব হয়ে এলেও, ভাগ্যক্রমে বাঙালীর ঘরেই যখন জন্মগ্রহণ করেছ তখন এ সমাজের দোষ কীর্ত্তন করলেই তো তোমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না।

ডাঃ উত্তেজিতকণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিলেন, বয় আসিয়া সেলাম জানাইল, হুজুর, খানা তৈয়ারি।

অতঃপর বাক্যব্যয় না করিয়া সাহেব ভোজনকক্ষে চলিলেন।

নবীনকালী স্বামীকে কহিলেন, বিয়ে তো ফুরুলো, এরই মধ্যে আমি কিন্তু ফিরছি না। দিনকতক কলকাতায় থেকে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস, মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে, কিছু জামা কাপড় কিনে জব্বলপুর যাব। একখানা ছোটখাটো বাড়ি দেখ।

সভয়কম্পিত অন্তরে শুষ্কস্বরে উকিল স্বামী বলিলেন, কিন্তু আমার কোর্ট যে পরশু খুলবে।

পরম উদাসীনভাবে নবীনকালী কহিলেন, বেশ তো, তুমি যাও, কোর্ট কর গে। ভুপেনকে নিয়ে আমি সব দেখে বেড়াব। ভাল কথা, এখন কিছু টাকা দিয়ে যাও, তারপর সেখানে গিয়ে মনিঅর্ডার ক'র। নদিদির মত ব্লাউজ, মেজদিদির মত গরদের লালপাড় শাড়ি, ফুলীর মত একটা ব্রুচ, আর বড়বউদির মত ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ি কখানা আমার চাইই।

উকিল স্বামী কোন উত্তর না দিয়া আলনায় টাঙানো আপনার দশ বৎসরের পুরাতন কোটটির পানে একবার সতৃষ্ণ করুণ নয়নে চাহিলেন।

সেজবউয়ের স্বামী কহিলেন, তুমি না হয় দিনকতক এখানে থেকে যাও। ছেলেপুলেগুলো ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হয়েছে, একটু সেরে উঠুক।

সেজবউ ছল ছল চক্ষে উত্তর দিল, আমার আসাই অন্যায় হয়েছে, চোর বদনাম কপালে লেখা ছিল, পেলুম। আর কেন? যার পয়সা নেই তার ওসব সাধ আহ্লাদ কেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্বামী বলিলেন, তা ঠিক। গরিবের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা।

বিদায়কালে বেলা একে একে সকলকে প্রণাম করিল। সকলেই নববিবাহিতাকে অবস্থানুযায়ী নূতন নূতন যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেজবউয়ের পায়ে প্রণাম করিতেই সে লজ্জাবিবর্ণ মুখখানি নত করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, স্বামী-সোহাগিনী হও, এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার নেই।

বেলা বলিল, কাকীমা, আমায় কিছু দেবেন না?

সেজবউ ম্লানমুখী হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, সোনাদানা কিছুই তো আমার নেই মা, আছে শুধু এই দুগাছা শাঁখা। এত লোকের সামনে এ বার করতে লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে বেলা।

বেলা সলজ্জ হাসি হাসিয়া তাঁহার হাত হইতে শাঁখা দুইগাছি লইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে আপনার মাথায় ঠেকাইল ও তেমনই পুলক-কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল, আজ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কেউ তো আমায় দান করেন নি, কাকীমা।—বলিয়া অবনত হইয়া আর একবার তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় লইল।

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ডাঃ মিটার সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আপন কন্যা মীরাকে কহিলেন, কি কুসংস্কার মীরা! লেখাপড়া জানা মেয়ে বেলার কাছে ওই ক্যাডাভ্যারাস শাঁখার মূল্যই বেশি হ'ল?

মীরা হাসিয়া বলিল, আমার কাছেও বাবা।

অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ডাঃ মিটার বলিলেন, তুইও একথা বলছিস মীরা?

মীরা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল, আমি হিন্দুধর্ম্মের কোনও শিক্ষাই পাই নি বাবা, কিন্তু মনুষ্যধর্ম্মের কিছু কিছু তোমারই কাছে শিখেছি। অন্তরের অকৃত্রিম দান ব'লে ওই শাঁখা জোড়াটা মাথায় তুলে নিতে আমিও রাজি আছি বাবা। মানুষকে যে এটুকু দিতেই হবে।

ডাঃ মিটার বলিলেন, আর এত ভাল ভাল দামী উপহারগুলো বুঝি কিছুই নয় মীরা?

মীরা হাসিয়া বলিল, ওখানে যে ঐশ্বর্য্যের পাল্লা দেওয়া চলেছে, একের অপরকে খাটো করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে ফুটে উঠেছে। তুমিই বল দেখি বাবা, উঠেছে কি না?—বলিয়া ক্ষণকাল পিতার পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল, আর আমি দেখেছি, সেজজেঠাইমা যখন বেলাকে শাঁখাগাছি দেন, তখন কত না লজ্জিত, কত না কুণ্ঠিত! কিন্তু চোখে মুখে ওঁর কি আন্তরিকতাই না ফুটে উঠেছিল। যেন কল্যাণময়ী মা, ঈশ্বরের কাছে অকপটে সন্তানের মঙ্গল কামনা করছেন।

কন্যার কথায় ডাঃ মিটার সহসা গম্ভীর হইয়া সিগার ধরাইয়া ধূম্র উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

আবর্ত্ত

রবীন আর পুলিন দুই বন্ধু। সদর মহকুমা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। অনেকটা পথ, শেয়ারের গাড়িও পাওয়া যায়, কিন্তু পুলিন পণ করিয়াছে, ওইটুকু রাস্তা হাঁটিয়াই শেষ করিবে। একে তো আসিবার সময় বাস-ভাড়া লাগিয়াছে দুই আনা, ফুটবলের মাঠে ঢুকিতেও গিয়াছে দুই আনা, জলখাবারে দুই এক পয়সা করিয়া একটি চকচকে আনিই বাহির হইয়া গিয়াছে, আধুলি হইতে যাহা আছে তাহাতে বাস-ভাড়া কুলাইলেও ভবিষ্যতের সঞ্চয় কিছু রহিবে না। সুতরাং পদযানই সর্ব্বোত্তম। বন্ধুর পণের প্রাণটুকু হরণ করিতে রবীনের সাহসে কুলায় নাই, অর্থাৎ অর্থের আশু অপকারিতা সম্বন্ধে তর্ক তুলিয়াও ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ীর যুক্তিকে সে কাটিতে পারে নাই।

অনেকটা রাস্তা, কিন্তু খেলাটাও হইয়াছে চমৎকার। তাহারই আলোচনা করিতে করিতে দিব্য হাঁটিয়া যাওয়া যায়। এমন তো চলিয়াছেও অনেকে।

সন্ধ্যা অত্যাসন্ন, রৌদ্রের উত্তাপ নাই। ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের পাকা রাস্তা। দুই ধারে বন আছে, বাগান আছে, সারি সারি খড়ের চালাযুক্ত গ্রামও এ-পাশে ও-পাশে পড়িতেছে। শীত থাকিলেও বা বাঘের ভয় করিত। দিব্য চলিয়াছে সকলে।

কিন্তু চলিতে গিয়াই পুলিনের পণরক্ষা বুঝি আর হয় না। গ্রামের মাঠে গতকল্য যে খেলাটি হইয়া গিয়াছে, বল রুখিতে গিয়া পুলিনের পা তাহাতে একটু মচকাইয়া যায়। সামান্য ব্যথা, পুলিন গ্রাহ্যের

মধ্যেও আনে নাই। এখন খানিকটা আসিয়া সেই ব্যথাটাই দিব্য জীবন্ত হইয়া উঠিল। এ-পাশ ও-পাশ পা হেলাইয়াও ব্যথা সমান তালে পাল্লা দিতে লাগিল।

একবার মুখ দিয়া বুঝি 'উঃ' শব্দও বাহির হইয়াছিল। রবীন বলিল, কি রে? পা চালিয়ে চল।

পুলিন বন্ধুর পানে করুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল, সেই মচকানির ব্যথা।

রবীন বলিল, তবে দু আনা পয়সার মায়া ক'রে বাসে চাপলি নে যে বড়?

পুলিন বলিল, বাস তো এখনও পাওয়া যায়। দাঁড়া না একটু।

রবীন দাঁড়াইল, এবং অর্থের মিতব্যয়িতা লইয়া বেশ একটু ছুলফুটানো-গোছ বক্তৃতাও দিতে লাগিল।

পুলিন বলিল, বল, বল, 'মাতঙ্গ পড়িলে দকে—পতঙ্গেতে কি না বলে'—বল।

রবীন হাসিতে লাগিল।

এমন সময় হর্ন দিয়া মৃদু মন্থর গতিতে বাস আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

চালক বলিল, আসেন বাবু, আসেন। বহুৎ খালি।

খালি অবশ্য ছিল না, তবে দাঁড়াইবার জায়গাটুকু ছিল। পল্লীর পথে যে সব বাস চলে তাহাতে সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব। সর্ব্বক্ষণ বিনয়ীর মত মাথা নীচু করিয়া যাইতে হয়। যাত্রাশেষে নামিবার সময় আড়ষ্ট ঘাড়ের বেদনায় কিছুক্ষণ ম্রিয়মাণ থাকিতে হয়।

যাহা হউক, এ ক্ষেত্রে পায়ের মচকানির চেয়ে ঘাড় খানিকক্ষণ আড়ষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই।

পুলিন হিসাবী, কহিল, কিন্তু দু আনা পাবে না, আমরা অনেকটা হেঁটে এসেছি, না হয় হেঁটেই যাব।

যথালাভ মনে করিয়া চালক বলিল, যা খুশি দেবেন, উঠুন।

দুই বন্ধু বাসে উঠিল।

যথাস্থানে নামিয়া পুলিন যেমন একটি আনি বাহির করিয়াছে রবীন অনুযোগভরা স্বরে বলিল, ছিঃ! ন্যায্য ভাড়া যা তাই দাও। কাউকে ঠকাবার প্রবৃত্তি যেন কখনও না হয়।

পুলিন প্রতিবাদ করিল, বাঃ রে, ঠকানো কিসের? এতখানি পথ হাঁটলাম, ওই তো বললে—

রবীন বলিল, পথ যতখানিই হাঁট, পায়ের ব্যাথাটা তোমার তো সত্যি। গাড়ি নইলে আসতেই পারতে না। যেটা সত্যিকারের দরকার, তার ওপর ফন্দি-ফিকির মিছে। ও যাই বলুক, তুমি কেন খাটো হ'তে গেলে?

পুলিন দুই আনাই দিল। দিয়া গজ গজ করিতে করিতে চলিল। পথে আরও কয়েকজন জুটিয়াছিল। পুলিনের উপর সমবেদনা প্রকাশ করিয়া উহারই মধ্যে কে একজন বলিল, ভারি আমার সাধু রে! বাপ করলে দোকান লুঠ, ছেলে বেড়ায় সাধুত্বের বক্তৃতা দিয়ে! বলিহারি সাধু রে!

কথাটা শুধুই রবীনের কানে গেল না, মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিল। মুখখানি তাহার আরক্ত হইয়া উঠিল। ভাগ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছিল নহিলে রবীন এ লজ্জা লুকাইত কোথায়?

জনশ্রুতিতে যদি বিশ্বাস করা যায় তবে পুলিনের সমব্যথীর মন্তব্য বহুলাংশে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয়।

রবীনের পিতা কোন আত্মীয়ের দোকানে কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন।

প্রকাণ্ড দোকান; মালিক কালেভদ্রে দোকানে পদার্পণ করিলেও হিসাব-নিকাশের ধার দিয়াও যাইতেন না। তিনি দেখিতেন সুদৃশ্য শো-কেসে সুন্দর সুন্দর শাড়ি ব্লাউজের পারিপাট্য, শুনিতেন কোথাকার রাজা বা জমিদার তাঁহার দোকানের খাতায় নাম লিখাইয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন—তাহারই কাহিনী, আর কর্ম্মচারীদের পানে চাহিয়া সগর্ব্বে ভাবিতেন এতগুলি প্রাণী আমারই কৃপাশ্রিত। বেশ প্রসন্ন মনেই তিনি দোকান পরিদর্শন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেন।

একদিন রবীনের পিতার বিরুদ্ধে কে একজন তাঁহাকে কি কথা বলিল। তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। অকপটে যে বিশ্বাস একজনের উপর ন্যস্ত করা যায়। সে লোক কখনও তাহার অপচয় করিতে পারে না।

এক দিন দুই দিন করিয়া অনেকবার অনেক লোকই তাঁহার কান-ভারি করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া ভাবিলেন, দেখাই যাক একদিন এই ঈর্ষালুব্ধ মানুষগুলির অভিযোগ কতটা সত্য!

সহসা একদিন দোকানে আসিয়া তিনি খাতাপত্র তলব করিলেন। ফলে যাহা বুঝিলেন তাহাতে সন্দেহের বীজকণা পল্লবিত হইয়া উঠিল।

তারপর কি হইয়াছিল কেহ জানে না। মাস কয়েক পরে শহর ছাড়িয়া রবীনের পিতা গ্রামে আসিয়া বসিলেন। যে কেহ কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালমাহাত্ম্য ও আত্মীয়ের অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে শতমুখ হইতেন। বয়স হইয়াছিল, কাজকর্ম্ম তিনি বিশেষ কিছুই আর করিয়া উঠিতে পারিলেন না, অথচ সংসার দিব্য নিরুদ্বিগ্নে চলিয়া যাইতে লাগিল। কেবলমাত্র সংসারের অসচ্ছলতার দোহাই

দিয়া পুত্রের পড়া ছাড়াইয়া দিলেন। আর একটি বৎসর হইলেই সে হোমিওপ্যাথিক কলেজ হইতে পাস করিয়া বাহির হইতে পারিত।

বাড়ি আসিয়া রবীন হাত মুখ ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল।

মা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন, আবার বসলি যে? আয় খেয়ে নিবি।

মুখ ভার করিয়া রবীন বলিল, পরে খাব।

পুত্রের মুখ ভার দেখিয়া মা উদ্বিগ্ন হইলেন, হ্যাঁরে, অমন মুখ ভার কেন? কি হ'ল?

রবীন মুখ তুলিয়া মায়ের পানে চাহিতে পারিল না।

মা কাছে আসিয়া তাহার মাথায় একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন, কি হয়েছে রে?

বন্ধুর কথার খোঁচায় যেটুকু উত্তাপ জমিয়াছিল স্নেহময়ীর স্পর্শে সেই ব্যথার বাঁধ চোখের জলে গলিয়া পড়িল। রবীন মায়ের কাছে সব খুলিয়া বলিল।

মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, লোকে অনেক কথা বলে, সব কি বিশ্বাস করতে আছে বাবা?

কেন লোকে বলে ও কথা?

মা হাসিলেন, তা হ'লে লোকের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বেড়াতে হয়।

রবীন বলিল, কই, আর কারও নামে তো ও কথা বলে না। আচ্ছা মা, সত্যি বল তো, আমাদের নাকি মেলাই বেনারসী আর সব ভাল ভাল কাপড় আছে?

আছেই তো। দোকানের পাওনা। তুই কি বলতে চাস সেগুলো না ব'লে নেওয়া?

কিন্তু আরও সব জিনিস আছে। তুমি কোন দিন বাবাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর নি?

ছিঃ! চাকরি খুইয়ে উনি মনের দুঃখে রয়েছেন, ওঁকে কি এখন ওসব কথা বলা যায়! আয়, খাবি আয়।

খাইয়া আসিয়াও রবীনের মন হইতে এই সব চিন্তা গেল না। কেন তিনি চাকরি ছাড়িলেন? অসাধুতা প্রমাণ না হইলে সে দোকান তাঁহাকে ছাড়িতে হইত না। পিতা যে সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন, তাহা তো সে যখন সে দিকে চায় বুঝিতে পারে। কি এ রহস্য!

ছেলেবেলায় 'আদর্শচরিত' পাঠ করিয়া অনেকগুলি উচ্চ আদর্শ সে মনে আঁকিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবের সংঘাতে একে একে সেগুলির রং ম্লান হইতে ম্লানতর হইতেছে।

'সদা সত্য কথা বলিবে।'

হিসাব করিয়া দেখিলে এ যাবৎ সে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে ও যে সব কথা বলিয়াছে তাহা নিছক মিথ্যা না হইলেও সত্যের ছদ্মবেশ তাহাতে অনেকখানি। দুই ধারের স্নেহ, সখ্যতা বা সম্মান বজায় রাখিয়া, কাহাকেও ব্যথা না দিয়া প্রতিদিনকার অনুষ্ঠিত যে সমস্ত আচরণ, সেগুলিকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তো সত্যাশ্রিত মিথ্যার স্বরূপ প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হয় না। পিতাকে সে ভক্তি করে, মাতাকে ভালবাসে ও তাঁহার কথা অমান্য করে না। কিন্তু কতকগুলি সন্দেহ মনে পুষিয়া সে যদি তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে না পারিল তো তাহার মত হতভাগ্য কে?

লোকে যাহা বলে বলুক, নিজের শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস সে শিথিল হইতে দিবে না। অন্যের ত্রুটিতে সে বড়জোর ব্যথা অনুভব করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার স্পর্দ্ধা তাহার যেন না আসে।

সহসা পিতার অসুখ হওয়াতে রবীন দিন কয়েকের জন্য প্রবল চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল। ডাক্তার ডাকা, ঔষধ-পথ্যের জোগাড় করা ইত্যাদিতে রবীনের সময় কাটিতে লাগিল।

একদিন সকালবেলায় ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই দেখিতে পাইল, মা একখানা মুর্শিদাবাদী সিল্কের শাড়ি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন। রবীনকে দেখিয়া যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে?

আজও ডাক্তার ডাকতে হবে তো, টাকাটা দাও।

মা বলিলেন, টাকা? দাঁড়া একটু, আমি একবার ও-বাড়ি থেকে আসি।—বলিয়া শাড়িখানি ভাঁজ করিয়া কাপড়ের মধ্যে লইলেন।

রবীন আর কোন কথা বলিল না। মা কি কাপড়ের বিনিময় করিতে চলিলেন? সত্যই কি ঘরে টাকার অভাব? অভাব হওয়া বিচিত্র নহে। বৎসরাবধি বাবা বাড়িতে বসিয়া আছেন। সে উপযুক্ত ছেলে, এক পয়সাও উপার্জ্জন তাহার নাই। মুখে আদর্শের বক্তৃতা দিয়া বেড়ানো সহজ, কিন্তু আদর্শকে খুঁজিয়া প্রাণদান করা রীতিমত পরিশ্রমসাধ্য। আজ যদি বাবা চলিয়া যান, সংসারের এই গুরুভার তাহাকেই বহন করিতে হইবে। অল্প পুঁজিতে সে হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেন্সারি খুলিবে, কিন্তু ঔষধ দিয়া দাম আদায় করা যে কতদূর শক্ত তাহা সে পল্লীগ্রামের ছেলে হইয়া ভালমতই জানে। জল বলিয়া ঔষধের উপর অশ্রদ্ধা যেমন আছে, দাম মিটাইবার বেলায় ঔদাসীন্যও তেমনই যথেষ্ট। অথচ ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। তিন বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া হোমিওপ্যাথিক কলেজে পড়িবার কালে অনেক আপিস সে ঘুরিয়াছে, অনেক কিছু সে দেখিয়াছে। অল্পবিদ্যার ক্ষেত্রই এককালে ছিল চাকরি; আজকাল বহুমুখী বিদ্যার দ্বারাও এটিকে আয়ত্ত করিতে রীতিমত বেগ পাইতে হয়। তাহার উপর আছে

সুপারিশ, আত্মীয়তার সূত্র। এই সূতাটি যদি না থাকিল তো অরণ্যে নিষ্ফল রোদনের মত বৃথাই কাগজ ও কালির অপব্যয়।

মা ফিরিয়া আসিলেন।

রবীন নির্ব্বিকারভাবে হাত পাতিয়া টাকা লইল, কোন প্রশ্নই করিল না।

চিকিৎসা ভালই হইল, কিন্তু রবীনের পিতৃবিয়োগযোগ কেহ রোধ করিতে পারিলেন না।

অর্থের অপ্রতুলতা যতই হউক বাঙালীর ছেলের বিবাহ সেজন্য কোন কালে আটকায় না। তবু রবীন তখন ডাক্তারি পড়িতেছিল, পিতাও ছিলেন কর্ম্মক্ষেত্রে। ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বলই ছিল; তেমনই দিনে মহাসমারোহে এই শুভকার্য্যটি—মানবজন্মের একমাত্র কাম্য বলিয়া রবীনের পিতা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

সংসার ঘাড়ে পড়িতেই রবীন বুঝিল বোঝাটি বড় কম নহে।

হরিশ মুদি, ছিদাম ঘোষ, পূর্ণ গড়াই লম্বা ফর্দ্দ তো দিলই, খুচরা দেনা এক করিলে শতের কাছাকাছি গিয়া দাঁড়ায়। রবীন শুষ্কমুখে মায়ের কাছে ফর্দ্দগুলি দাখিল করিল। তিনি বলিলেন, ওদের পরশু আসতে বলে দে।

কি করিয়া যে মা দেনার টাকা মিটাইলেন রবীন জানিল না। স্বস্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরের ঘরে ডিস্‌পেন্সারি সাজাইয়া বসিল।

ডিস্‌পেন্সারি সাজাইয়া বসিল, ওই পর্য্যন্তই। রোগীর দেখা বড়-একটা মেলে না; যে সব রোগী নিরুপায় হইয়া হোমিওপ্যাথির শরণ

নয় অর্থের দিক দিয়া তাহারা অবাঞ্ছনীয়। রবীনের মনটা তখনও সংসারের ঘা খাইয়া কঠিন হইয়া উঠে নাই। এই সমস্ত দুঃখী দরিদ্রের ব্যথা সে নিজের অন্তর দিয়া গ্রহণ করে।

এমনই করিয়া কয়েক মাস চলিবার পর মা একদিন বলিলেন, রবি, আর আমি চালাতে পারি না, বাবা। গয়না বলতে একখানিও রাখি নি, দেনা শুধতে স্যাকরার দোকানে তুলে দিয়েছি। ধারও দু পাঁচ টাকা হয়েছে এর ওর কাছে। হ্যাঁরে, মাস গেলে কি কুড়িটা টাকাও ওষুধ বেচে হয় না?

রবীন শুষ্কমুখে মায়ের পানে চাহিল।

মুখ দেখিয়া মায়ের বুকখানা কেমন করিয়া উঠিল। বলিলেন, পাস না যে কিছু, জানি। কিন্তু একটুখানি শক্ত হ বাবা। সংসারের লোক নিতে জানে ষোল আনা, দিতে পারে না এক পয়সাও। উনি চিরটা কাল প্রাণপাত করে দোকানে খাটলেন, শেষবয়সে গেল চাকরি।

রবীন কোনমতে বলিল, এ মাসটা চালিয়ে নাও মা, আসছে মাস থেকে দেখব চেষ্টা ক'রে।

চেষ্টার ত্রুটি নাই, চিন্তারও বিরাম নাই, কিন্তু যে পথ দিয়া লক্ষ্মীর শুভাগমন হইবে সেই পথটিই রহিল অন্ধকারে ঢাকা।

ডাক্তারখানায় বসিয়া রবীন সেই ঘনতমসা-পারের পথটিকে চিনিবার দুশ্চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পুলিনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ওরে রবি, একটা কল আছে।

রবীন চমকিত হইয়া বলিল, কল? কোথায়?

পুলিন চেয়ারে বসিয়া কণ্ঠস্বর নামাইয়া বলিল, গোয়ালাপাড়ায়, মোটা পাওনা। পারবি?

রবীন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার পানে চাহিল।

পুলিন বলিল, আমাদের বাড়ি দুধ দেয়—ওই যে মাখনা, আজ কেঁদে এসে পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে, দাদাবাবু বাঁচান। মেয়েটার জন্যে বুঝি সর্ব্বনাশ হয়। সব শুনে তাকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তারপর তোর কথা মনে হ'ল। যদি পারিস, গোটা-দশেক টাকা মিলতে পারে। আছে তোদের হোমিওপ্যাথির এমন কোন দাওয়াই?

রবীন হাসিয়া বলিল, তুই তো নিজের কথাই পাঁচ কাহন করলি। রোগ শুনলাম না, রোগী দেখলাম না—

পুলিন বলিল, রোগী দেখবার দরকার নেই, তবে রোগটা শোন বলি।

টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পুলিন চুপি চুপি কি বলিল। রবীনের চোখের কোণে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। রুষ্টস্বরে সে বলিল, তুই না আমার বন্ধু? তোর মুখে এমন কথা শুনতে হ'ল?

পুলিন বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ! ডাক্তারের কাছে রোগী যদি ওষুধ চায়—

রবীন তেমনই গম্ভীর স্বরে বলিল, তা সে যত অন্যায়ই হোক সে ওষুধ পয়সার লোভে ডাক্তার জোগাবেই। না পুলিন, ডাক্তারের ব্যবসা রোগ আরোগ্য করা, পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। ঐ মেয়েটির গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করবার সাহায্য আমা দ্বারা হবে না, তা সে যত টাকাই দিক না কেন।

রবীনের দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া পুলিন এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু রাগ সে করিল না। সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যেও বন্ধু অন্তরে যে সততার অগ্নিকণা জ্বালিয়া রাখিয়াছে, সে আগুনকে পবিত্র হোমানলের মতই তাহার মনে হইল।

আরও কয়েকটি বৎসর পরে।

রবীনের আয় যৎসামান্য হইয়াছে, কিন্তু তদনুপাতে পোষ্য সংখ্যা হইয়াছে দ্বিগুণ। উপার্জ্জনের সামান্য কয়টি টাকা মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত। অভাব-অনটনের সঙ্গে যুঝিয়া আপন স্নেহপক্ষপুটে আগুলিয়া রবীনের মা এই কয়টি প্রাণীকে বাহিরের ঝড় জল হইতে এতকাল বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। কি করিয়া কোথা হইতে যে তিনি টাকা সংগ্রহ করিয়া অভাব-অভিযোগ মিটাইয়া দেন সে সংবাদ রবীন জানে না, রবীনের বউও জানে না।

শ্রাবণের এক অপরাহ্নে মেঘ করিয়া বৃষ্টি নামিল। রবীনের মা ছাদের উপর ভিজা কাঠ শুকাইতে দিয়াছিলেন, ভিজিতে ভিজিতে সেগুলি তুলিলেন। বৃষ্টির জলে ডাল সুসিদ্ধ হয় বলিয়া কলসি কয়েক জল ধরিলেন। এমনই করিয়া ঘণ্টাখানেক ভিজিয়া যখন কাপড় ছাড়িতে গেলেন তখন বেশ শীত বোধ হইতে লাগিল।

বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, বউমা, সন্ধ্যেটা তুমিই দেখিও। আমার শীত শীত করছে, একটু শুই। কাঁথাখানা দিও তো মা।

বাস্, সেই শোওয়াই শোওয়া। তিন দিন পরে রবীনকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ বাবা, একটা কথা তোর কাছে লুকিয়ে রেখেছিলাম, ইচ্ছে ক'রেই বলি নি, পাছে তুই দুঃখ করিস। শোন।

রবীন কাতর কণ্ঠে বলিল, আজ থাক, ভাল হয়ে ব'ল।

না বাবা, রোগের কখন কি হয় বলা যায় না, শুনে রাখ। তুই একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলি, হ্যাঁ মা, আমাদের নাকি অনেক ভাল ভাল কাপড় আছে? আমি বলেছিলাম, আছে, তবে সেগুলো না ব'লে নেওয়া নয়, ওঁর পাওনা।

রবীন চঞ্চল হইয়া বলিল, আজ থাক না মা।

না রে, শোন। শুনেছি যারা চাকরি করে, তাদের চাকরি ছাড়িয়ে দিলে হয় পেন্সন দেয়, না হয় মোটা টাকা। বুড়ো বয়সে খাটবার ক্ষমতা তো থাকে না, তাই কোম্পানি দয়া করে। কিন্তু বিনি-দোষে বুড়ো বয়সে ওঁকে চাকবি ছাড়িয়ে দিলে, এক পয়সা দিলে না। রাগ করে উনি যা পেয়েছিলেন্ কাপড়, জামা, টাকাকড়ি এনেছিলেন।

রবীন যেন পাথর বনিয়া গিয়াছে। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া মায়ের পানে চাহিয়া আছে।

মা বলিতে লাগিলেন, লোকে বলবে অন্যায়, কিন্তু উনি ধর্ম্মত কোন অন্যায় করেন নি। মরবার দিন আমায় বললেন, দেখ, ছেলেটা যেন না শোনে এ কথা। হয়তো রাগ ক'রে যা করেছি, তা অন্যায়ই। লোকে আমায় দুর্নাম দিচ্ছে। আমি বললাম, না, অন্যায় কর নি। আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাই যদি, লোকে চেয়েও দেখবে না। তুমি স্থির হও; যদি অন্যায়ই হয়, সে অন্যায় যেন তোমার আমার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, ছেলেকে যেন না ছুঁতে পারে। তাই করেছি বাবা। ওঁর আনা সব জিনিসই একে একে বিক্রি ক'রে দিয়েছি। আজ যদি আমি মরি, কাল তোকে অন্যায় ক'রে নেওয়া জিনিসের এক টুকরো দিয়েও সংসার চালাতে হবে না। সব শেষ ক'রে দিয়েছি। —বলিয়া শ্রান্তিতে তিনি চক্ষু মুদিলেন।

বহুক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, রবীন তেমনই চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছে।

আপনার একখানি উত্তপ্ত হাত দিয়া রবীনের ডান হাতখানি তিনি বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বলিলেন, জানি দুঃখ পাবি, কিন্তু না ব'লে যে আমি শান্তিতে মরতে পারতাম না রে। বড় দুঃখ, নয় রে?

রবীন শুধু বলিল, না।

পুরাপুরি সংসার ঘাড়ে পড়িতেই রবীন দেখিল, এখানে ছিদ্র বহু। এদিকে তালি দিতে গেলে ওদিকের ফাঁক বাড়িয়া যায়, ওদিকের অভাব মিটাইতে গেলে এদিকের অনশন ভ্রূকুটি হানে। মাথার উপর আবরণ নাই, পাশে দেওয়াল নাই, কোথাও বসিয়া যে ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলিবে ততটুকু সময়ও হাতে নাই।

ছোট ছেলেমেয়েগুলি অবুঝ; সময়ে-অসময়ে বাপের কাছে হাত পাতে, আবদার করে, না পাইলে রাগ করিয়া কাঁদিয়া জ্বালাতন করে। অভাবের তীব্র তাড়নায় ঠাণ্ডা মেজাজের রবীন কেমন যেন রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। ধমক তো দেয়ই, চড়টা-চাপড়টাও চলে। বউ অবশ্য সব সময়েই সুধা বর্ষণ করে না। ছেলেমেয়ের পক্ষ লইয়া দুই কথা বলিতে গেলেই পাশের বাড়ির লোকে কৌতুকে কান পাতিয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়ায়। লজ্জিত হইয়া রবীন সরিয়া পড়ে।

আগের দিন রাত্রিতে বউ জানাইয়া দিয়াছিল, একটিও পয়সা আর ঘরে নাই, উপার্জ্জন না করিতে পারিলে কাল প্রাতে হাঁড়ি চড়িবে না। দুশ্চিন্তায় রবীন সারারাত্রি ঘুমায় নাই। সংসারের চিন্তা ছাড়িয়া সে কেবল বাবার কথাই ভাবিয়াছে, মৃত্যুকালে মা যেসব কথা বলিয়া গিয়াছিলেন সেই সব কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিয়াছে, অন্যায় তাঁহারা কিছুমাত্র করেন নাই। সততার পুরস্কার যেখানে মুখের সামান্য একটি সাধুবাদেও লোকে উচ্চারণ করিতে চাহে না, সেখানে সাধুতা মূর্খতারই নামান্তর। মা ঠিকই বলিয়াছিলেন, অন্যায় কিছু নাই। যেখানে লোকে নিজের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়া লইতে চায়,

জনমত ধিক্কার দিয়া অমনই কালি ছিটাইতে থাকে। অন্যায় তাহার পিতা কিছুমাত্র করেন নাই। আর যদি অন্যায়ই করিয়া থাকেন, সে অন্যায় তাঁহাদের সঙ্গে শেষ হইয়াছে—কে বলিল? সে অন্যায় বংশ-পরম্পরায় চলিতে থাকুক। সন্তানদের সে শিক্ষা দিয়া যাইবে, নিজের গ্রাস মুখে তুলিতে নিজের যে কোন চেষ্টা—অবশ্য আইন-বিগর্হিত এমন কিছু নহে—নিন্দনীয় নহে। অক্ষম সাধুতার মত পাপ আর নাই।

প্রথমেই আসিল পরাণের বিধবা স্ত্রী।

আর বাবা, কাল রাত থেকে তেমনই জ্বর, চোঁয়া-ঢেঁকুর।

রবীন শক্ত হইয়া বলিল, দিনকতক ওষুধ খেতে হবে, আর পয়সা চাই, বুঝলে?

পয়সা কোথা পাব বাবা। ধান ভেনে খাই, গরিব-দুঃখী মানুষ—

তা হ'লে ভাল ওষুধও পাবে না। পয়সা না দিলে ওষুধ কিনব কি দিয়ে?

অগত্যা পরাণের স্ত্রী আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া চারিটি পয়সা টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, হেই বাবা, আর নেই, দুঃখী মানুষ। ভাল ওষুদ দিস বাবা।

রবীন টেবিলের পানে চাহিল না, ঔষধ ঢালিয়া বলিল, চার দাগ, চার ঘণ্টা অন্তর, বুঝলে?

পরাণের স্ত্রী গমনোন্মুখী হইতেই রবীনের ইচ্ছা হইল উহাকে ডাকিয়া পয়সাকয়টা ফিরাইয়া দেয়। আহা, দুঃখী মানুষ! কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে অন্য কয়েকটা রোগী আসিয়া পড়ায় সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল না। ভাবিল, কাল ফিরাইয়া দিব।

রোগীরা রবীন-ডাক্তারের ভিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইল, যে যাহা পারিল দিয়া ঔষধ লইল।

অবশেষে গাঙ্গুলী-বুড়াকে পয়সার কথা বলিতেই তিনি বলিলেন, তুই বলিস কি রে রবে, এক শিশি জল দিয়ে পয়সা নিবি?

রবীন বলিল, না হ'লে আমার চলবে কিসে?

গাঙ্গুলী হাসিলেন, হ্যাঁ, তোর আবার চলবার ভাবনা। তোর বাবা যা রেখে গেছে—

তীব্রস্বরে রবীন বলিল, পরের ধন কেউ কম দেখে না। ওসব বাজে কথা রেখে শুনুন, পয়সা যদি দিতে পারেন তো ওষুধ পাবেন, নইলে পথ দেখুন।

গাঙ্গুলী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইঃ, পয়সা দেবে? পয়সাই যদি দোব তো তোর জল-ওষুধ খেয়ে মরি কেন? গাঁয়ে কি আর পাস-করা ডাক্তার নেই? ভারি অহঙ্কার, বাপ দোকান লুট ক'রে রাজা করেছে ব'লে আমরা ভয় ক'রে চলব নাকি?—বলিতে বলিতে তিনি কোমরের কাপড়টা ভাল করিয়া কষিয়া পরিলেন। কাপড় পরিবার সময় ট্যাঁকে গোটা-কয়েক টাকা ঈষৎ শব্দ করিয়া উঠিল এবং উহারই মধ্যে একটি টাকা গড়াইয়া নিঃশব্দে পাপোষের উপর পড়িল। ক্রুদ্ধ গাঙ্গুলী জানিতেও পারিলেন না, ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তারখানা বন্ধ করিবার সময় রবীন টাকাটা দেখিতে পাইয়া পাপোষের উপর হইতে তুলিয়া লইল। মনে মনে হিসাব করিল, কাহার টাকা হইতে পারে? কিন্তু বহুক্ষণ ভাবিয়াও কিছু ঠিক করিতে পারিল না। ভাবিল, কাল যাহারা ঔষধ লইতে আসিবে তাহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে।

জিজ্ঞাসা করিবার কথা মনে হইতেই সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল। কি মূর্খ সে! যাহাকে সে টাকার কথা সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করিবে সেই

যে টাকার দাবি করিবে না তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? এই বিতরণের কোন মানেই হয় না।

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় রবীন আর একবার হাসিল। হাসিয়া টাকাটা পকেটে ফেলিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া দিল।

লোকে বলাবলি করে, রবানটা কি চশমখোর দেখেছ? ওই তো জল-ওষুধ; তাই দিয়ে গরিব-দুঃখীর কাছে টাকা নেয়। টাকা চাইবার সে কি ধুম, কাবলীকেও হার মানায়!

কিন্তু যে যাহাই বলুক, রবীন চিকিৎসা করে ভাল। গরিব-দুঃখীরা সামান্য পয়সা দিয়া তাহার ঔষধ লইয়া যায়। সেই সামান্য পয়সায় রবীনের ক্রমবর্দ্ধিত সংসারের ফাঁক অবশ্য ঢাকে না। কিন্তু যেটুকু ঢাকে তাহাই যথেষ্ট। মাঝে মাঝে মনটার ভিতর কেমন খচ খচ করিতে থাকে। এই সব দুঃখীর রক্ত-জল-করা সামান্য পয়সা লইয়া এ দুর্নাম কেনা কিসের জন্য? কিসের জন্য—সে কথা বাড়ির মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলে প্রতিক্ষণে মনে হয়। যেখানে সে নামিয়াছে সেখান হইতে কেহ কোন দিন পা তুলিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসে নাই। কূলে আছাড় খাইয়া যে স্রোত নদীর গর্ভে ফিরিয়া যায় তাহার টানে নিম্নাভিমুখী হওয়াই বিধান। চারিপাশে এই ফিরিয়া-আসা স্রোতের আকর্ষণ, উপরের তীরভূমির পানে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া কি লাভ?

পুলিনকে ডাকিয়া সেদিন বলিল, কি হে কল-টল আর আসে না? তোমাদের সেই বুড়ো গয়লা কি বলে? কথাটা পুলিন প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, রবীন বৎসর-কয়েক পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে পুলিন বুঝিতে পারিল। হাসিয়া বলিল, আচ্ছা যা হোক, কবে কি একটা অন্যায় অনুরোধ করেছিলাম, তার খোঁটা দেওয়া আজও গেল না।

রবীন গম্ভীর মুখে বলিল, না রে, খোঁটা দেওয়া নয়। সত্যিই আজ তেমন কল পেলে নিই। এখন যে টাকার বড দরকার।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া পুলিন সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

হাসলি যে বড় ?

তোমার মুখ দেখে আর কথা শুনে। যেন সত্যিই অমন কাজ পেলে তুমি বর্ত্তে যাও।

সত্যিই বর্ত্তে যাই।

যাও যাও, তোমায় যেন আমরা চিনি না। সেই বাসে আসার কথা কোন দিন ভুলব না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রবীন বলিল, তবে শোন পুলিন, আজই এমন-ধারা একটা কল নিয়েছিলাম, বাউরিপাড়ায়। টাকা অবশ্য একটাই পেয়েছি। একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, তাই বা দেয় কে ?

সত্যি ? তুমি ?

আমিই।—বলিয়া রবীন হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিল।

পুলিন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, আমি যাই। ওবেলা এসে তোমার প্রলাপ শুনব।

বাড়ির মধ্যে আসিয়া রবীন ডাকিল, ওগো শুনছ, পুলিন তো বিশ্বাসই করলে না, আমি অমন কাজ করতে পারি।

বউ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, কি যে আদিখ্যেতা কর! কাজটা মন্দ কিসে ? রোগ হয়েছে ওষুধ দিয়েছ, টাকা নিয়েছ। বাস্, এ নিয়ে আবার ঢাক-পেটানো কেন ?

রবীন হাসিয়া বলিল, সত্যি খুব খানিকটা চেঁচাতে ইচ্ছে করছে। ভারি আনন্দ হচ্ছে।

মরণ।—বলিয়া বউ পিছন ফিরিল।

রবীন ডাকিল, ওগো শোন, মরণ না হয় আমার, কিন্তু পাওনাদার শুনবে কেন? আজ টাকা না দিলে চাল-ডাল বন্ধ।

কেন, আজকের টাকাটা কি হ'ল?

পথেই কলুমাগী ধরলে, ছ-মাসের দাম পাওনা। মুখ ছুটিয়ে আদায় ক'রে নিলে।

সকালে ডাক্তারখানায় কিছু হয় নি?

অষ্টরম্ভা, লোকের রোগ হ'লে তো আসবে।

তবে কি আমার চুড়ি কগাছা খুলে দোব?

যদি দয়া হয়।

বউ এইবার বিষম রাগিল। রাগিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিতে লাগিল। পাশের বাড়ির জানালার কপাট খুলিতেই রবীন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে আত্মগোপন করিল।

রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া বউ মড়াকান্না কাঁদিতে লাগিল।

ঘরের মধ্য হইতে রুক্ষ গলায় রবীন বলিল, ভাল আপদ! শোন এদিকে।

বউ রোয়াক হইতে ক্রন্দনের স্বরে ঝাঁঝিয়া উঠিল, শুনব আবার কি? তোমার হাতে যখন পড়েছি অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে। হাতে মালা—

তবু বকবক করে, শোনে না।

বউয়ের কান্না সহসা থামিয়া গেল। দীপ্তকণ্ঠে কহিল, কি? শুনব আবার কি? ঘরের মধ্যে যাই আর হাত মুচড়ে চুড়ি কগাছা কেড়ে নাও!

এ কথায় রবীন স্তব্ধ হইয়া গেল। বহুক্ষণ কোন কথা কহিতে পারিল না। বুকের মধ্যে কান্নার সমুদ্র তোলপাড় করিয়া উঠিল।

সেই বধূ—সেই ভালবাসা! কাহার জন্য আজ তীর ছাড়িয়া পাঁকভরা নদীতে সে নামিয়াছে? কাহার জন্য দিনের পর দিন এই উঞ্ছবৃত্তি? বৃথাই কলঙ্কের মালা গলায় পরিয়া জনসমাজে সে হেয় হইয়া রহিল।

রাগের মাথায় কথাটা অত্যন্ত রূঢ় হইয়া গিয়াছে, বউ সে কথা বুঝিল। বুঝিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল, কি? কেন ডাকছ?

রবীন ধরা-গলায় বলিল, তুমি ঠিকই বলেছ, অভাবের তাড়নায় হয়তো কোন দিন তোমার গয়নায় হাত দিতে পারি। যাও যাও, সামনে থেকে সরে যাও।

বউ সরিয়া গেল না। আরও নিকটে আসিয়া রবীনের গায়ে একখানি হাত দিয়া বলিল, রাগের মুখে বেরিয়ে গেছে। দিনরাত কিচি-কিচি, এতে শরীর যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়।—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্ষণপূর্ব্বের কান্নার সহিত এই কান্নার কতই না প্রভেদ!

স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া খানকয়েক বাসন বাঁধা রাখাই ঠিক করিল। সে টাকা ফুরাইলে রবীনের নজর পড়িল, বহুদিনকার অব্যবহৃত বাক্সবন্দী হার্মোনিয়মটার উপর। সচ্ছল অবস্থার দিনে এটি কেনা ছিল; যাহার ঘরে অন্নপূর্ণা বিমুখ তাহার গান গাহিয়া দেবী বীণাপাণির বন্দনা শোভা পাইবে কেন?

ভাল খাটখানি কেন ঘর জোড়া করিয়া আছে? মেঝের খোয়া কোথাও উঠে নাই, মাদুর পাতিয়া উহাতেই শোওয়া চলে। এত

ছোট ঘরে আবার শো-কেস? কাপড়-জামা সাজাইয়া রাখিবার মত একখানিও নাই, আছে—ঘূর্ণীর কারিকরের হাতে-গড়া এক রাশ মাটির ফলমূল। যাহারা সাজাইয়া রাখিতে পারে তাহারাই রাখুক; এ বাড়িতে ওই একরাশ মাটি শিল্পনৈপুণ্যের জন্য প্রশংসা পাইবে না, বরং উনুন গড়িলে কতকটা কাজে লাগিতে পারে। মস্ত বড় দাঁড়া-আয়না! সাজিয়া-গুজিয়া মুখ দেখিতে কে উহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে? যেমন কাপড়ের শ্রী, তেমনই দেহের!

রান্নাঘরের মাচায় অনেকগুলি কোদাল, কুড়ুল, দা রহিয়াছে। যেন নূতন করিয়া একতলার উপর ঘর উঠিবে! উহার একখানি করিয়া থাকিলেই যথেষ্ট। দালানে খানকয়েক কাঁঠাল-কাঠের তক্তা বহুদিন হইতে রাখা হইয়াছে। ওগুলি রাখিয়া খানিকটা জায়গা জোড়া করা বই তো নয়!

এইরূপে একে একে অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস সংসার হইতে বিদায় লইল।

সেদিন বাহিরের ডাক্তারখানায় বসিয়া আছে, এমন সময় পুলিনকে দেখিতে পাইয়া রবীন ডাকিল।

পুলিন বলিল, সময় ক'রে উঠতে পারি না। রবিবারে একটা দিন ছুটি, সংসারে কাজও যেন অফুরন্ত। দু দণ্ড ব'সে গল্প করার সময় মেলে না।

রবীন হাসিয়া বলিল, সংসার এমনিই বটে। সংসারের চাবুক আছে ব'লেই আমরা চলি, নইলে বেতো ঘোড়ার মত এক জায়গায়

শুয়েই পড়তাম। তোমরা তবু চাকরি কর, মাস গেলে বাঁধা মাইনে, আর আমাদের?

না রবীন, তোরাই বরং সুখী—কারও তাঁবেদারী করতে হয় না, অসুখ হ'লে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না।

বেশ বেশ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কি রকম সুনাম পাড়ায় পাড়ায় শুনছ?

পুলিন বলিল, তোমাকে যারা জানে না তারাই অনেক বলবে, যারা জানে তারা শুনে মনে মনে হাসবে।

তুমি দেখছি আমার বেজায় ভক্ত। এ ভক্তির হ্রাস বোধ করি কোনও কালে হবে না?

আশা তো করি।—বলিয়া পুলিন উঠিল। উঠিয়া বলিল, ভাল কথা, একটা গরু কিনতে হবে, একটু সন্ধান রেখ তো। ছেলেদের দুধ কিনে আর পারা যায় না।

বাড়ির মধ্যে আসিয়া রবীন বলিল, একটা উপায় যেন হবে মনে হচ্ছে। আমার এখনও কিছু মূলধন পুঁজি আছে দেখলুম।

বউ আনন্দিত হইয়া বলিল, পোষ্টাপিসে রেখেছ বুঝি? কত টাকা?

সে পুঁজি নয়। গরুটা অনেক দিন থেকে বেচব মনে করছি, কিন্তু খদ্দের হয় না। খদ্দের যদি হয়, দাম ওঠে না।

বউ বলিল. ওই পুঁজি! পোড়াকপাল! কার মরণ যে ওই ভাগাড় পয়সা দিয়ে কিনবে?

কেন যার ভক্তি আছে। মনে করছি পুলিনকে বেচব। তার একটি গরুর দরকার।

বাজে কথা মনে করিয়া বউ আর সেখানে দাঁড়াইল না।

বৈকালে পুলিনকে ডাকিয়া রবীন বলিল, গরু কিনবে ? আমারই বাড়িতে আছে।

পুলিন বলিল, তোমার ছেলেরা দুধ খাবে না ?

রবীন বলিল, পয়সা হ'লে বাঘের দুধ কিনতে মেলে, গরুর দুধ তো ছার ! কিন্তু ভাই, কুড়ি টাকা দিতে হবে। একটানে দু সের দুধ দেয় গরুটা।

পুলিন বলিল, টাকার কথা পরে, কিন্তু তোমায় বঞ্চিত ক'রে ও গরু আমি কিনব না।

রবীন বলিল, না যদি কেন, অন্য জায়গায় বেচতে হবে। টাকা আমার চাই-ই। হয়তো টাকা পাঁচেক কম হবে।

পুলিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবীনের পানে চাহিল। না, রহস্য সে করিতেছে না। বয়স রবীনের কতই বা, তবু মুখে অনেকগুলি রেখা পড়িয়াছে। মাথার চুলও যেন দুই-একগাছি পাকিয়াছে। কৌতুক-প্রিয়তায় চোখের দৃষ্টি মোটেই চঞ্চল নহে, কেমন যেন অবসন্নতার স্তিমিত জ্যোতি।

একটু থামিয়া সে বলিল, বেশ, ওই দরই ঠিক রইল। আসছে রবিবার—

রবীন তাড়াতাড়ি বলিল, আজই আমার টাকা চাই, গরুও তুমি আজ নিয়ে যাও।

পুলিন বলিল, টাকা আর লোক নিয়ে আমি আসছি।

খানিক পরে পুলিন ফিরিয়া আসিল।

রবীনের হাতে নোট দুইখানি দিয়া বলিল, এই দুখেকে দেখিয়ে দা'ও আছেই, গরুটা নিয়ে যাক।

পুলিন বাড়ির বাহিরে কাঁঠালতলায় দাঁড়াইল, দুখেকে লইয়া রবীন বাড়ির মধ্যে ঢুকিল।

খানিক পরে গরু লইয়া দুখে চলিয়া গেল। পুলিন রবীনের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় বাড়ির ভিতর হইতে স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন শোনা গেল।

বউ বলিতেছে, ওমা, সত্যিই ও ভাগাড় নিয়ে গেল! আট বিয়েনের গাই দুধ দেবে, না ছাই।

রবীনের কহিতেছে, বলেছিলাম না, কিছু মূলধন পুঁজি আছে এখনও, দেখলে তো? ও বিশ্বাসই করতে চায় না যে, আমি কাউকে ঠকাতে পারি।

বউ বলিল, তা যাই বল বাপু, বন্ধু মানুষ, তাকে ঠকানো তোমার ভাল হয় নি। হয়তো কত গাল দেবেন।

রবীন বলিল, গাল দেবে? তা দিক। কিন্তু একটু আক্কেল তো হবে।—বলিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া এই প্রতারণার কাহিনী শুনিয়াও পুলিনের চক্ষু দুইটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল না। ডান হাতে কোঁচার খুঁটটা তুলিয়া চোখের কোণ ঘষিতে ঘষিতে সে দ্রুতপদে সেস্থান ত্যাগ করিল।

স্কুলের ছেলে

শিল্প-প্রদর্শনী খুলিতে আর বিলম্ব নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে অধ্যাপক এন. রায়কে কতকগুলি ছবি ও মাটির পুতুল পাঠাইয়া অনুরোধ করা হইয়াছে, তিনি যেন উহারই মধ্যে কতকগুলি বাছিয়া প্রদর্শনীর জন্য নির্ব্বাচন করিয়া দেন। কয়েকখানি পত্র এবং লোকের তাগাদা চলিতেছে; অধ্যাপক কিন্তু সময় করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় প্রদর্শনী খুলিবার মাত্র সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে অধ্যাপকের নিকট হইতে যে পত্রখানি আসিল—তেমন পত্রের প্রত্যাশা কেহই করেন নাই।

"ক্ষমা করিবেন। ছবি ও ক্লে-মডেলিং বাছাই করিবার যে গুরুভার আপনারা আমায় দিয়াছিলেন, সে ভার বহন করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে এই ভার দিবেন। আপনাদের প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি। ইতি—"

যে ঘটনা সংসারে অহরহ ঘটিতেছে—সাড়ম্বর ভূমিকা দিয়া তাহাতে রং ফলাইবার প্রয়োজন মিথ্যা। তথাপি নির্ম্মলের বর্ত্তমান জীবন-তরু যে ভূমিকার ভূমিতে শাখাপল্লব মেলিয়াছে সেটুকু বাদ দিলে

কাহিনী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, সুতরাং ক্লান্তিকর ভূমিকার পুনরাবৃত্তি না করিয়া উপায় নাই।

শহর-ঘেঁষা গ্রাম, নামটা অপ্রকাশিত থাকুক। শহর ও পল্লীর সুবিধা-অসুবিধা দুইই বর্ত্তমান। গোটা তিনেক হাই-স্কুল আছে, তাহারই একটাতে নির্ম্মল পড়ে। পড়ে বটে, মন পড়িয়া থাকে স্কুল-সীমার বাহিরে। বাহিরে—যেখানে ছেলেরা কোলাহল জমাইয়া চু-কপাটি খেলে, ক্রিকেট কিংবা ফুটবলের ভিড় জমে, অথবা মোড়ের পানের দোকানের রোয়াকে নানা দেশ, নানা জাতি ও ভবিষ্যৎ জীবনকে লইয়া গল্প জমে, সেখানে নহে,—নদীতে যাইবার পথে বন-জঙ্গলে ঘেরা কুমোর-পাড়াতে ঘূর্ণ্যমান চক্রের মাথায় হাত দিয়া যেখানে নিপুণ কারিকর হাঁড়ি গড়িতে থাকে, সেইখানে। মাটির দাওয়া, উপরে খড়ের চাল; দাওয়ার মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গহ্বর এবং গহ্বরের মধ্যে সেই চক্রযন্ত্র। যন্ত্রের মাথায় কাদা চাপাইয়া কুম্ভকার পা দিয়া ঘোরায় চাকা, আর হাতের টিপে হাঁড়ি, গেলাস, খুরি, কেমন অনায়াসে ইচ্ছামত বাহির হইয়া আসে। হাতের টিপে কুমোর যে পুতুল গড়ে, তাহাও চাহিয়া দেখিবার মত।

পাঠ্য-পুস্তকের বাঁধা-ধরা বুলি নিত্য বলিয়া যাওয়াতে তো একটুও আনন্দ নাই; অথচ এই সব ক্ষুদ্র জিনিসকে যতই আগ্রহ ও যত্ন দিয়া সম্পূর্ণ ও সুন্দর করিতে পারা যায়, মনের আনন্দ ততই কূল ছাপাইতে থাকে।

পুতুল তৈয়ারির আকর্ষণ নির্ম্মলের এমনই প্রবল হইয়া উঠিল যে স্কুলে আসিবার সময় এক তাল কাদা কচুপাতায় মুড়িয়া পকেটের মধ্যে করিয়া আনিতে সে ভুলিত না।

সেদিন পণ্ডিত মহাশয় তন্ময় হইয়া ধাতুরূপ দিয়া ছাত্র তৈয়ারি

করিতেছেন, এবং নির্ম্মলের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে পণ্ডিত মহাশয়েরই শ্মশ্রুসমাকুল রুক্ষ মুখ—পড়াইবার আলস্যে পণ্ডিতের ঢুলু ঢুলু দুইটি চোখ এবং কদমছাঁট চুলের কর্কশত্ব, মায় টিকি সমেত। ক্রমে ক্রমে সেই মুখে ফুটিয়া উঠিল বার্দ্ধক্যচিহ্নিত কয়েকটি বলিরেখা, বিরক্তিতে তীক্ষ্ণ, ক্লান্তিতে অবসন্ন এবং বয়োধর্ম্মে শিথিল।

ধাতুরূপের ধাতু বদলাইয়া গেল, মূর্ত্তি দেখিয়া পাশের ছেলেরা হাসিতে লাগিল।

হাসি সংক্রামক ব্যাধি।

পণ্ডিতের টেবিল পর্য্যন্ত সেই শব্দ পৌছিয়া তাঁহার তন্দ্রা টুটাইয়া দিল এবং কর্কশ কণ্ঠে তিনি হাঁকিলেন, হাসি কিসের? এত হাসি কিসের?

শাসনে হাসি কমে না, বাড়িয়াই উঠে, এবং ইঙ্গিত অনুসরণে পণ্ডিতের দৃষ্টি গিয়া পড়িল নির্ম্মলের মুখের উপর। সে মুখে যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—পণ্ডিত তাহার অন্য অর্থ করিয়া বেতগাছি তুলিয়া লইলেন, এবং সামনে আসিয়া নির্ম্মলের গঠিত মূর্ত্তি একদৃষ্টে অল্পক্ষণের জন্য দেখিয়াই ক্রোধে তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মুখের তন্দ্রাতুর ভাব, রেখা, এমন কি টিকিটির নিরীহ বিন্যাস প্রভৃতি বদলাইয়া গেল। তারপর তরুণ শিল্পীর উপর বাক্য ও বেতের যে বর্ষণ আরম্ভ হইল, তাহার তুলনা শ্রাবণধারার সঙ্গেই দেওয়া চলে।

কিন্তু শাসনের শেষ এইখানেই নহে।

পরিবার বৃহৎ না হইলেও শাসকের অভাব ছিল না। বাপের চেয়ে কাকার রাশ ছিল ভারি; তিনি শাসন অন্তে কুমোর-পাড়ায় বসাইলেন প্রহরী। 'অঙ্কুরে বিনাশ না করিলে বিশাল মহীরুহ'······ইত্যাদি প্রবচনগুলি তাঁর মুখস্থ। কি সকাল, কি দুপুর, কিবা বৈকাল দুইধারের

খন আসশ্যাওড়ার বুক চিরিয়া বিসর্পিত পথটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেই নির্ম্মলের [illegible] উহারা বুঝিয়া লন। ঐ পথ আমবাগানের মধ্য দিয়া, [illegible]ক্ষেত পাশে রাখিয়া, সোজা চলিয়া গিয়াছে সজিনাগাছ-ভরা কু[illegible]র আঙ্গিনায়। স্যাকরা-ডোবার মাটি খুব আঁটালো, হাঁড়ি, গেল[illegible]ল প্রভৃতি তো উহাতে ভাল তৈয়ারি হয়ই, গৃহস্থের উনানের প্র[illegible]ও সে মাটির চাহিদা আছে। আগে সে মাটি নির্ম্মলই আ[illegible] দিত বাড়ির প্রয়োজনে, এখন কড়া হুকুম জারি হইয়াছে, ও মাটি [illegible]নহেই, দো-আঁশলা বেলে-মাটিও সে স্পর্শ করিতে পারিবে না। [illegible] ছেলে পড়িতেছে স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, ময়লা মাটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার [illegible]হার প্রয়োজন কি? স্কুলের ছেলের পাঁচ দিকে মন লাগাইয়া পড়া মাটি করা কোনমতেই উচিত নহে। স্কুলের ছেলে, উপরে রঙ্গিন আকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে না, নদীকিনারে বসিয়া পৃথিবীর প্রসার দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিবে না, সূতায় টানা ঘুড়ির মত থাকিবে সংযত। সে সূতা পাঠ্য-পুস্তক, এবং জগতের উহাই একটিমাত্র [illegible] যেখানে মন স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে। স্কুলেব ছেলে, [illegible] ওর নিজেরই অকল্যাণ; অভিভাবকদের শাসন, বেত তো কল্যাণীয়দের ভবিষ্যতের পানে চাহিয়াই। যে দিন-কাল, চাকুরি আর জুটিবে নেই। তবু কয়েকটা পাস দেওয়া থাকিলে—ইত্যাদি। তিনি

শাসনে নির্ম্মলের নেশা কাটিল কিনা কে জানে, কাহাকেও কোন কথা বলিল না। চটি খাতাখানি খুলিয়া তাহারই মাঝখানে সে যত্ন করিয়া লিখিল :

মানুষের প্রয়োজনে ধরণীর নহে আয়োজন,
চাতক কাঁদিয়া মরে, মেঘ তারে করিছে শাসন।

কি অদ্ভুত মোহ এ দুইটি লাইনের! নির্ম্মলের যত কিছু দুঃখ-ব্যথা

কবিতার লাইন কয়টা কানে আসিতেই বিলীন হইয়া গেল। ঠিক যেন দুপুর রৌদ্রের উত্তাপ বাঁচাইতে ছায়াঘন আম... দিয়া কুমোর-পাড়ায় যাত্রা। একটা কিছু করিবার আশায় ... অধীর, একটা মহান আবিষ্কার, অপ্রত্যাশিত লাভ।

চটি খাতা তো দুইদিনেই শেষ হইল।

মোটা খাতা আনিয়া নির্ম্মল আঁকিল ছবি; ছবির নীচে ... করিয়া কবিতা। আজকাল মাসিকের পৃষ্ঠায় সে এই রকম ছবি ... দেখিয়াছে।

ছবির বিষয়-বস্তু বেশি যত্ন করিয়া নির্ম্মলকে খুঁজিতে হইল। প্রথমেই পেন্সিলের রেখায় ধরা পড়িল সেই অপূর্ব্ব চক্রযন্ত্র। তা... চাল-দেওয়া উঁচু দাওয়া, পুষ্পিত সজিনাগাছ, কুমোর-বাড়ির অঙ্গন এবং অঙ্গনের দূর্ব্বাদল। অঙ্গনের পাশে পোয়াটাক পথ দূরের নদীটিকে নির্ম্মল বসাইয়া দিল। এইবার নদীতে খানকয়েক জেলে-ডিঙ্গি আর ...গোটাকতক পদ্মফুল ফুটাইয়া দিতে পারিলেই—

লইতে সহসা কান দুইটিতে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেই তাহার জন্য ...তা কাটিয়া গেল, দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল ...গম্ভীর মুখে কাকা। তন্দ্রাতুর ...।

গেল। ...হিতেই গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনি ছুটিল, সকালবেলায় ব'সে ব'সে দিব্বি হইল, ...আঁকা হচ্ছে যে! -বলি, এটাও কি স্কুলের ড্রয়িং?

নির্ম্মল তো পাথর বনিয়া গিয়াছে।

কাকা অতঃপর পাথরে প্রাণ সঞ্চার করিলেন, এ বিষয়ে তিনি দক্ষ গাল দুইটিতে গোটাকয়েক চড় কসাইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, পাজি, হতভাগা, খেলা করবার আর সময় পাও নি? দাদা, দাদা, এস এদিকে একবার, দেখে যাও বাঁদরের কীর্ত্তি।

শুধু দাদা নহে, পরিজনস্থ সকলেই আসিলেন। দাদা অর্থাৎ নির্ম্মলের পিতা খাতা দেখিয়া মন্তব্য করিলেন, তা এঁকেছে মন্দ নয়। ছোঁড়া বুঝি—

তত্‌ক্ষণে বারুদে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। মহাশব্দে ফাটিয়া পড়িয়া কাকা বলিলেন, তোমাদের আস্কারা পেয়েই তো ও এত বেড়েছে। নইলে স্কুলের ছেলে পড়া ছেড়ে আঁকছে মাথামুণ্ডু, আর তোমরা দিচ্ছ বাহবা! কোথায় ধমকাবে—

দাদা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, সে তো তুই আছিসই। আমি শুধু বলছিলাম, ছবির হাত—

কাকা কথাটা শেষ করিতে দিলেন না, যাচ্ছেতাই। যাও তোমরা এখান থেকে, শাসন কেমন ক'রে করতে হয় সে আমি জানি।

মেয়েরা হাউ-মাউ করিয়া উঠিলেন, ওরে বাছা, সেবারকার মত হাত চোরের মার যেন মারিস নি, শেষকালে গা-হাত টাটিয়ে জ্বর না আসে।

কাকা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ওই তো! আদর দিয়ে দিয়েই ওর মাথাটা খেলে! থাক, যা ভাল বোঝ কর, আমি আর এর মধ্যে নেই। বলিয়া রাগ করিয়া খাতাখানি কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

তিনি শাসনের রজ্জু শিথিল করিলেও নির্ম্মল সে গণ্ডি পার হইতে সাহস করিল না। সেও মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, ওদিকে আর নয়। অবাধ্য মনকে যেমন করিয়াই হউক বশে আনিতে হইবে।

এমনই সে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যে বাড়ির লোক পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

ওরে নিমু, যা বাবা, একটুখানি বেড়িয়ে আয়।

কেন?—রুষ্টস্বরে নির্ম্মল প্রশ্ন করিল।

দিনরাত ঘরে ব'সে থাকলে শরীর খারাপ হবে যে।

শরীর খারাপ হবে ব'লে পড়া খারাপ করতে হবে? বাঃ, বেশ যুক্তি তো তোমাদের!

একটু বেড়ালে আর মহাভারত অশুদ্ধ হয় না রে।

না, হয় না! বলব কাকাকে যে তুমি পড়ার সময় খালি ঘ্যান-ঘ্যান করছ?

কাকার নামে সকলেই ভয় পায়। মাও দমিয়া গিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো কি বলেছে দিনরাত পড়া তৈরি করতে?

নির্ম্মল রুষ্ট স্বরেই বলিল, না, বলে নি! বলে নি তো যখনই বেরুই, দেখি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে! পাহারা দেওয়া আমি বুঝি না, না?

মা বলিলেন, সে তো তোকে কুমোর-বাড়ি যেতে মানা করে। নইলে—

যাও যাও মা, আঁকটা মোটেই মিলছে না।

ছেলের তাড়া খাইয়া মাকে পলাইতে হয়।

কিন্তু খাইবার সময় আবার তাঁহার কোমল কণ্ঠে অনুরোধের সঙ্গে সেই মমতা ফুটিয়া উঠে।

দেখ ছেলের খাওয়া! আর একখানা মাছ এনে দিই। উঠিস নি, উঠিস নি, ওরে, দুধ আছে।

দুধ খেতে গেলে স্কুলের বেলা হয়ে যাবে।

মা এইবার রাগ করিয়া বলেন, হোক গে বেলা। একে তো

দিনরাত ঘরের কোণে ব'সে ব'সে পড়া, তার ওপর একটু দুধ কি মাছ না খেলে শরীর কদিন টিঁকবে ?

সে মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া নির্ম্মল উঠিয়া পড়িল। আঁচাইতে আঁচাইতে বলিল, শরীরের জন্যে কিছু ভেব না মা, ভাল ক'রে পড়তে পারলে ও-সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা সেই দিনই নির্ম্মলের কাকার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ও কি না খেয়ে, না বেড়িয়ে শুধু বই নিয়ে শুকুবে ? এতে কখনও শরীর ভাল থাকে ?

কাকা হাসিলেন, ভেব না বউদি, শরীর ওতে ভালই থাকবে। ছোঁড়াটার একটা গুণ আমি লক্ষ্য করেছি, জেদ আছে। যখন যেটা ধরে সব ভুলে তাতেই মেতে থাকে। নইলে দেখ নি, কাদার পুতুল গড়া, ছবি আঁকা, পদ্য লেখা কোনটাই তো নেহাৎ নিন্দের করে নি ! কম কষ্টে কি ও-সব ঝোঁক ছাড়িয়েছি ! এখন খবরদার, কিছু ব'লে ওকে বিরক্ত ক'র না, তা হ'লেই পড়ার ওপর এই ঝোঁকটুকু চ'লে যাবে, হবে একটি আস্ত বাঁদর।

এমন দীর্ঘ বক্তৃতার পর নির্ম্মলের মা আর কি বলিবেন ! চুপ করিয়াই রহিলেন।

বাড়ির মধ্যে দূরদৃষ্টি যদি কাহারও থাকে তো সে নির্ম্মলের কাকার আর স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের। তাঁহাদেরই শাসন কিংবা প্রখর দৃষ্টির গণ্ডিবদ্ধ হইয়া সে দিব্য পাস করিল। পাস করিল প্রথম বিভাগে—বৃত্তির সহিত।

কাকা সুখবরটা দিয়া বলিলেন, কেমন বউদি ?

নির্ম্মলের মা আনন্দে গদগদ স্বরে বলিলেন, ধন্যি তুমি ঠাকুরপো। তোমারই জন্যে। উনি তো তোমার ভরসায় কিছুটি দেখেন না।

শুধু নির্ম্মলের মা নহে, প্রতিবেশীরাও বলিল, হাঁ, অমন বাঘের মত কাকা, তাই—

নির্ম্মল কাকাকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, কোথায় ভর্ত্তি হবি ঠিক করলি ?

প্রেসিডেন্সিতে।

বেশ, বেশ। যা, পাড়ার সকলকে প্রণাম ক'রে আয়।

ভাল ছেলের মত নির্ম্মল আদেশ পালন করিতে গেল।

প্রণামের পালা শেষ করিয়া সে আম-বাগানের পথ ধরিল. বহুদিনকার পরিত্যক্ত পথ। পথের দুইপাশে বনজঙ্গল হইয়াছে। আম প্রায় শেষ হইয়াছে, পাকা কাঁঠালের গন্ধে বন ভরিয়া আছে। আম-বাগানের নীচে তেমনই ঘন ভাঁট-বন, বসন্তের দিনে উহার গাঁটে গাঁটে ধরিত সাদা ফুল। গন্ধও বাহির হইত সুমিষ্ট। সকালবেলা সেই ফুলে আনন্দগুঞ্জন করিয়া মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করিত। সূর্য্য উঠিবার আগে তখনও আবছা অন্ধকার—আম-বাগানের তলায়, ফুরফুরে বাতাস লাগিত সমস্ত শরীরে, কানে বাজিত মৌমাছির মধুসঞ্চয়ের আনন্দ-রাগিণী। ভাঁট-ফুলের গন্ধে ও শোভায় মন ও চক্ষু পরিতৃপ্তি লাভ করিত। রাত্রি ও প্রভাতের সেই সন্ধিক্ষণটিকে মনে পড়িল। এই পথ দিয়াই সে কুমোর-পাড়ায় যাইত।

শেয়াকুল-কাঁটায় আজ আর কাপড় আটকাইয়া গেল না, পাকা বৈঁচির প্রলোভনেও নির্ম্মল ফিরিয়া চাহিল না। কুমোরদের উঠানের ধারে আসিয়া দেখিল, কঞ্চির আগড়টা বেড়ায় ঠেসানো আছে। বহুদিন হইল সজিনাগাছের ডাঁটা সমেত ডালগুলি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে,

নবপল্লবে গাছটিকে টোপর-পরা বরটির মতই দেখাইতেছে। ভিতরের দাওয়ায় কুমোর বসিয়া তেমনই যন্ত্র ঘুরাইতেছে, আর হাতের ঠেলায় গড়িয়া উঠিতেছে তেমনই হাঁড়ি, সরা ইত্যাদি।

আজ আগড় ঠেলিয়া এখানে বসিয়া একটি বেলা কাটাইয়া গেলেও কেহ কিছু বলিবেন না। কাদা মাখিলেও ভৎর্সনা করিবার কেহ নাই, চাই কি পুতুল দিয়া কাহারও প্রতিমূর্ত্তি গড়িলে তিনি হয়তো খুশিই হইবেন।

মিনিট কয়েক আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া নির্ম্মল কি ভাবিল কে জানে, ভিতরে না ঢুকিয়া সর্পিল বনপথ ধরিয়া সে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

এই তো গেল ভূমিকা। ভূমিকার নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মলের ভেলা যে জনপদ আশ্রয় করিয়াছে সেখানকার সমৃদ্ধির কথা থাকুক, কাহিনীটুকুতেই আমাদের প্রয়োজন।

নির্ম্মল প্রোফেসার হইয়াছে। মাহিনা মোটা, সংসার নিরুদ্বিগ্ন। প্রোফেসার হইবার সুসংবাদে গ্রামস্থ সকলের আনন্দ একখানি ছোট চিঠিতে সে প্রথম জানিতে পারে। চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন পণ্ডিত মহাশয়। কয়েকটা লাইন তাহার এইরূপ—

"তোমার কৃতিত্বে আমাদের যে কতখানি আনন্দ তাহা ক্ষুদ্র পত্রে লিখিয়া কি জানাইব! আমি জানিতাম, তোমার মধ্যে ভবিষ্যৎ সাফল্যের বীজ উপ্ত ছিল; ছিল না পথের স্পষ্ট নির্দ্দেশ। সেদিন বোধ হয় মনে আছে, যেদিন ক্লাসে কাদার মূর্ত্তি গড়িয়া আমার বেত

খাইয়াছিলে? বাড়িতেও কম লাঞ্ছনা ভোগ কর নাই। নদী যেমন গতি বদলায়, সেই শাসন তোমার জীবনকে করিয়াছিল নিয়ন্ত্রিত এবং তাহারই ফলে—"

তারপরের অংশটুকুতে শাসকদের কৃতিত্ব ও কৃতজ্ঞতার দাবি, অনেক দৃষ্টান্ত, অনেক উপদেশ।

নির্ম্মল উপার্জ্জনের প্রথম টাকা কয়টি শুভাকাঙ্ক্ষীদের সম্মানস্বরূপ খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু ও-সব কথা, অর্থাৎ নির্ম্মলের কথা থাক।

শহরের মাঝখানে অধ্যাপক এন. রায়ের বাড়ি, মাস মাস ভাড়া গণিতে হয়। হাতে বেশ কিছু টাকা জমিয়াছে, বালিগঞ্জ অঞ্চলটিও কাঞ্চন-কৌলীন্য ও আধুনিক অভিজাত্যের দিক দিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু দূর বলিয়া অধ্যাপক রায় ইতস্তত করিতেছেন। মিসেস রায় কিন্তু এই অঞ্চলের পক্ষপাতী। টী-পার্টি, টেনিস-পার্টি, সান্ধ্য-ভ্রমণ কোন্‌টার সুবিধা না ওই অঞ্চলে বিদ্যমান? একটু দূর? একখানা মোটর কিনিলে সে অসুবিধায় কি যায় আসে! তাহা ছাড়া দিবারাত্র ছাত্রের ভিড় তাঁহার পছন্দ হয় না। সেই একঘেয়ে নীরস তর্ক, একই বিষয়, একই প্রতিপাদ্য। জীবিত ও মৃত কবিদের কীর্ত্তিকলাপ লইয়া এত কোলাহল তিনি ভালবাসেন না। তর্কের আসর যেমনই জমিয়া উঠে, ভিতরে আহারের ঘণ্টাধ্বনি অমনই কর্কশ হইয়া তাঁহাকে থামিবার ইঙ্গিত করে। তর্ক অসমাপ্ত রহিয়া যায়, অধ্যাপক হাসিমুখে সকলের নিকট বিদায় লন।

সেদিন ভিতরে আসিতেই মিসেস রায় বলিলেন, কলেজে সারাদিন ব'কে আবার সন্ধ্যেবেলায় ওদের সঙ্গে বকতে ভাল লাগে?

অধ্যাপক হাসিলেন।

ঈষৎ উষ্ণ হইয়া মিসেস রায় বলিলেন, তোমার কেবল হাসি! চল না আজ বেড়িয়ে আসি মীনাদের ওখান থেকে।

অধ্যাপক মৃদু আপত্তি করিলেন, আজ থাক।

মিসেস রায় বলিলেন, বুঝেছি, গল্প গেল তো লেখা নিয়ে বসবে। কিন্তু তোমায় সত্যি বলছি, আজ কোন কাজ করতে দোব না, আলো দোব নিবিয়ে।

দিও।—নির্লিপ্ত স্বরে অধ্যাপক উত্তর দিলেন।

মিসেস রায় তাঁহার পানে চাহিয়া সকৌতুকে বলিলেন, কোন কষ্ট হবে না তোমার, সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি।

ইস, তা আর হ'তে হয় না। আলো নিবিয়ে প্রায় দেখি নি আর কি! ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বেস পড়ছে, ঘন ঘন উঠছে হাই, এপাশ ওপাশ ফিরছই ফিরছই।

কি করি বল, ঘুমের ওপর তো জোর নেই। ওই একটা জিনিস, অভ্যাসে যাকে জয় করা শক্ত।

ঘুম না হ'লে খানিক গল্পও তো করতে পার আমার সঙ্গে।

তোমার সঙ্গে গল্প না ক'রেই যে তোমাকে বুঝতে পারি; কথা কইলে তোমরা যে হারিয়ে যাও।

কথার উত্তরটি দেওয়া আছে ঠিক। কেন, ছাত্রদের সঙ্গে কথা কইবার উৎসাহ কোনদিন তো কম দেখলুম না!

অধ্যাপক হাসিলেন, ওদের সঙ্গে কারবারই যে আমার কথার। ওরা তো আমায় দেখতে আসে না, শুনতে আসে কথা। নিতান্ত বাঁধাধরা বিষয় নিয়ে চলে আলোচনা, সুতরাং ওদের ভোলানো খুব সহজ।

যত শক্ত আমায় ভোলানো! কৃত্রিম ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া মিসেস রায় সরিয়া গেলেন।

অধ্যাপক তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু সত্যই ক্ষুধার্ত্তকে ডেকে এনে পরিহাস করা তোমার উচিত নয়।

আহারান্তে অধ্যাপক আলমারির দিকে হাত বাড়াইতেই মিসেস রায় তাঁহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, এখন ও-সব চলবে না। ব'সে একটু গল্প কর। বেশ, অন্য গল্প নয়, ওরই গল্প হোক।

দুজনে চেয়ারে বসিলেন। সামনে ছোট টিপয়ের উপর ছোট একটা ফুলদানি, তাহার পাশে মীনার কাজ করা রূপার রেকাবে পানের মশলা—এলাচ, লবঙ্গ, মৌরি, দারুচিনি ইত্যাদি। অধ্যাপক পান খান না, মশলাও খান কম। কখনও কখনও গল্প করিতে করিতে গোটা দুই লবঙ্গ গালে রাখিয়া বইয়ের পাতা উলটাইয়া পেন্সিলের দাগ টানেন, পাশের খাতায় নোটও লেখেন।

মিসেস রায় রেকাবিটা সামনে ঠেলিয়া দিতেই একটি এলাচ তুলিয়া তিনি মুখে দিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, ওই আলমারির গল্প, ও নেহাৎ বাজে। তার চেয়ে—

মিসেস রায় গ্রীবাভঙ্গি করিলেন, না, ওই কথাই বল। একরাশ খাতা ওর মধ্যে, এত ছবির অ্যাল্‌বাম, আর নীচের তলায় কাদার পুতুলে সব নম্বর দেওয়া। তুমিই কি ওগুলোর একজামিনার?

অধ্যাপক হাসিলেন, হ্যাঁ। বিচারক বলতে পার। আর্ট-একজিবিশানে কোন্ কোন্ ছবি, কোন্ কোন্ ক্লে-মডেলিং রাখা যেতে পারে—তারই নম্বর দিয়ে আমায় ঠিক করতে হবে।

আর খাতাগুলো ?

সে আর এক ব্যাপার। কি একটা স্বর্ণপদকের জন্য লেখা প্রবন্ধ। পাঁচজন বিচারক করবেন তার বিচার, তার মধ্যে আমিও একজন। লেখা প'ড়ে আমায় রায় দিতে হবে।

মিসেস রায় হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন, হাসলে যে ? আমার যোগ্যতায় নিশ্চয়ই তোমার সন্দেহ আসে নি।

যদিই আসে ?

অধ্যাপক শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বলিতে দিলেন না। বলিলেন, আসা সম্ভব, উচিত। কেন না, ও লাইন আমার নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য মীনা, লাইন নিয়ে তো দেশের লোক মাথা ঘামায় না। তাঁরা যোগ্যতা বিচার করেন একটিমাত্র মাপকাঠিতে। বিশ্ববিদ্যালয় আমার কপালে যে জয়টীকা এঁকে দিয়েছেন, তাকে মুছে ফেলবার সাহস কারও নেই। পি. এইচ. ডি., পি. আর. এস—একি সোজা কথা! সুতরাং, আমি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ।

কথা শেষে অধ্যাপক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মিসেস রায়ও হাসিলেন, হাঁ, সে তো ঠিকই। লেখার বিচার মানলুম তোমার দ্বারা সম্ভব, কিন্তু ছবি বা ক্লে-মডেলিং—

সবই সম্ভব মীনা, সবই সম্ভব। যদি লেখার বিচার করতে পারি, ছবি বা মূর্ত্তির বিচারে আমার বাধা নেই। কিন্তু আমি জানি কোনটাই আমার নয়। বই প'ড়ে নোট লেখা, ছাত্র নিয়ে তর্ক করা, কলেজের লেকচার সুন্দর ক'রে মনে গেঁথে দেওয়া—শুধু ওই সবই আসে। যেমন লোহার লাইনের ওপর রেলগাড়ি চলে মাপা সময়ে, মাপা গতিতে, সুশৃঙ্খলে। কিন্তু আমি হয়েছি আকাশযান, সময়ের মাপজোক নেই, লাইনের প্রয়োজন নেই, শৃঙ্খলার কথা বলাই বাহুল্য।

মিসেস রায় বলিলেন, সে কথা যাক। মানলুম তুমি রসগ্রাহী, বিচারশক্তিও তোমার আছে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমার বিচার-প্রণালী দেখে।

কেন?

রোজই তুমি আলমারি খোল, ছবি বার কর, পুতুল বার কর, কিন্তু না দাও নম্বর, না কর কোনটা বাতিল। এই তো চলছে মাসখানেক ধ'রে। এই রকম যদি চলে—

অধ্যাপক হাসিলেন।

হাসলে যে? যা হয় সত্যি একটা ঠিক ক'রে ফেল। বেশ তো, আজ রাত্রিতে আমিও না হয় তোমায় সাহায্য করব।

পারবে সাহায্য করতে?

অবশ্য বিদ্যা দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়েও নয়, রুচি দিয়ে তোমায় সাহায্য করব। আর্ট আমি বুঝি না, তবে সাধারণ ভাল মন্দ কিছু কিছু বুঝতে পারি।

বেশ তো, খোল আলমারি। নিয়ে এস কতকগুলো বেছে, এই টেবিলের ওপর রাখ। আজ ছবি থাক, ক্লে-মডেলিংগুলোই আন।

মিসেস রায় আলমারি খুলিয়া কতকগুলি মূর্ত্তি বাছিয়া বাহির করিলেন। একে একে সেগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, এস, আজ এইগুলির বিচার করা যাক। তারপর তিনি একটা পুতুল হাতে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, দেখেছ আনাড়ি কারিকরের কীর্ত্তি! দেহের চেয়ে হাতগুলো কি বড় বড়!

অধ্যাপক হাসিয়া পুতুলটি হাতে লইলেন।

মিসেস রায় ক্ষিপ্র করে কাগজের প্যাড ও লাল নীল পেন্সিল লইয়া কাগজের উপর লাল ঢেরা-চিহ্ন কাটিয়া বলিলেন, নাও, সই কর।

অধ্যাপক বিস্ময়ে চাহিয়া বলিলেন, মানে ?

মানে বাতিল। বেশি দেরি ক'র না, চটপট সই কর।

অধ্যাপক আর একবার হাসিলেন, আজ তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়েছ দেখছি।

মিসেস রায় ভ্রূকুটি করিতেই অধ্যাপক বলিলেন, তাদের কতটা শ্রম, কত সময় ও কত উদ্বেগ দিয়ে ওই পুতুলটি গ'ড়ে উঠেছে, তা তুমি বুঝতে চাইছ না।

মিসেস রায় সবিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তুমি এসব সত্যি বলছ, না ঠাট্টা করছ ?

সত্যিই বলছি। পরীক্ষার জন্য জিনিস পাঠিয়ে তাদের মনে যে কতখানি উৎকণ্ঠা! প্রত্যেক দিনের দণ্ড তারা গুণছে। তারা হয়তো ফলাফল জানতে কতবার আমার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, সাহস ক'রে ঢুকতে পারে নি। কতবার ফুটপাথে পায়চারি করতে করতে এই ঘরের দিকে চেয়ে ভেবেছে, না জানি তার জিনিসটি নিয়ে আমরা কি সব কথাই বলাবলি করছি!

কথা বলিতে বলিতে অধ্যাপকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।

মিসেস রায় বলিলেন, পুতুলটা তুমি এমনভাবে দেখছ, আর এমন-ভাবে ওর শিল্পীর সম্বন্ধে কথা কইছ, যেন ওটা তোমারই অপটু হাতের তৈরি, বাতিল হ'লে তোমার বুক ভেঙে যাবে।

অধ্যাপক হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, কিন্তু সত্যি যেন আমি এর শিল্পীকে দেখতে পাচ্ছি। এই অক্ষম অসম্পূর্ণ রচনার পেছনে দাঁড়িয়ে সে, শুকনো মুখে ছলছল চোখে। আচ্ছা, তুমিই বল তো, যিনি এটা তৈরি করেছেন, তিনি ভবিষ্যতের একটা ছবিও কি আঁকেন নি সেই সঙ্গে ? মেডেল না পাক, এটা যদি একজিবিশানে স্থান পায়

তা হ'লে তিনি কি মনে করবেন না, তাঁর পরিশ্রম সার্থক? এবং সেই উৎসাহই তাঁকে হয়তো ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী ক'রে তুলবে।

মিসেস রায় বলিলেন, ও হ'ল দরদের কথা। কালো কুৎসিত ছেলের ওপর বাবা-মার স্বাভাবিক টানটা যেমন বেশি হয়, খানিকটা মমতায় ভরা, তেমনই। কিন্তু অক্ষম শিল্পী তোমাদের উৎসাহ পেলে এমনও তো মনে করতে পারেন যে, তিনি যা তৈরি করেছেন তা নিঁখুত। সেই সঙ্গে মনে জাগবে তাঁর অহঙ্কার এবং ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার।

অধ্যাপক মাথা নাড়িয়া সে কথা স্বীকার করিলেন। মিসেস রায় বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন ওর ত্রুটি বার ক'রে যদি বাতিল কর, শিল্পী সাবধান হতে পারবেন। ভবিষ্যতে তিনি আরও সতর্ক হয়ে কাজে নামবেন।

অধ্যাপক বলিলেন, তুমি যা বলছ, সে হ'ল সাধারণ পরীক্ষার প্রণালী। কিন্তু পরীক্ষকের কি হৃদয়ের সম্পর্ক রাখতে একেবারে নিষেধ?

মিসেস রায় হাসিলেন, সে তো তুমি ভালই জান। তোমার কাছে যেন কোন দিন কোন ছেলে নোট লিখে নম্বর হারায় নি! যাক ও-সব কথা, সত্যিই কি তুমি ওগুলো দেখবে, না তুলে রাখব?

চেয়ারটায় সোজা হইয়া বসিয়া অধ্যাপক রায় বলিলেন, না, আজ রাত্রেই ওগুলো শেষ করতে হবে। দাও পেন্সিল।—বলিয়া কাগজে সই করিয়া অন্য একটি পুতুল হাতে তুলিয়া লইলেন।

তারপর পুতুলটি নিরীক্ষণ করিয়া কাগজে কাটিলেন লাল পেন্সিলের ক্রস-চিহ্ন, নীচে করিলেন নাম সহি। মিসেস রায় বলিলেন, ওটা কিন্তু চলতে পারত।

কিসে?

হাত, পা, মুখের ভঙ্গি কোনটাতেই খুঁত নেই। অধ্যাপক পুতুলটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, রেখাজ্ঞান এঁর কম। আধ-বুড়ো ভিখারী, মুখের অসহায় ভাবটি সুন্দর, গড়নে কোথাও খুঁত নেই, কিন্তু মুখটা ভাল ক'রে দেখ। এ মুখ কোনও যুবকেরও বলতে পার। অকালবার্দ্ধক্যের কয়টি রেখা যদি থাকত তো সৃষ্টি হ'ত সম্পূর্ণ।

মিসেস রায় বলিলেন, কিন্তু এত কঠোর হওয়া কি ভাল?

ভাল। শিল্পীর ত্রুটিটুকু ভবিষ্যতে আর পার না হয়তো। দেখ, দরদ রাখতে গেলে এর কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলবে না, বিচার করতে হ'লে হতে হবে নির্ম্মম।—বলিয়া হাসিলেন।

তারপর ক্ষিপ্র করে বাছাই ও বাতিল চলিতে লাগিল। কাজ যখন শেষ হইল তখন ঘড়িতে একটা বাজিয়া গিয়াছে। সে দিকে চাহিয়া অধ্যাপক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, বাস্, আজকের মত কাজ শেষ। থাক আলমারি খোলা, আলো নিবিয়ে ওপরে যাই চল।—বলিয়া তিনি নিজেই সুইচ টিপিয়া আলোটা নিবাইয়া দিলেন ও মিসেস রায়ের হাত ধরিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

দুই জনেই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। শয়নমাত্র আলস্যে দুই জনেরই চক্ষু মুদিয়া আসিল। মিসেস রায় ঘুমাইয়া পড়িলেন, অধ্যাপক ঘুমাইলেন না। অথচ জাগিয়াও যে রহিলেন তাহা নহে। চক্ষু মুদিয়া আধ-তন্দ্রার মধ্যে তিনি যেন কোথায় পায়চারি করিতে লাগিলেন—নীচের সেই ঘরখানিতেই; মৃদু আলোকে সব কিছু দেখা যায়। চেয়ার, আলমারি, টেবিল, টেবিলের উপর সেই পুতুলগুলি, কাগজের উপর লাল পেন্সিলের ক্রস, তার নীচে স্বাক্ষর। পরীক্ষোত্তীর্ণ পুতুলগুলির

মুখে আলোটা কিছু উজ্জ্বল, অন্যগুলি তরল অন্ধকারের মধ্যেও কেমন যেন ম্লান। রাত্রিশেষের পৃথিবীতে কৃষ্ণাতিথির ব্যাপ্তি—অদূরে আবছা দিনের আলো, কিন্তু বিদায়-মুহূর্ত্তের অন্ধকার কি রূঢ়, কি স্থূল! ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারি করিতেছেন। গতি দ্রুত, অন্তরের ক্ষুব্ধতা প্রত্যেক পদক্ষেপে ফুটিয়া উঠিতেছে, নিশ্বাস-পতনে জমিতেছে মালিন্য, চোখের দৃষ্টি সন্ধান হারাইয়া স্তিমিত। শিল্পীর দুঃখে তিনি কি বেদনা অনুভব করিতেছেন?

যদিই তরুণ শিল্পী এ আঘাত কাটাইয়া উঠিতে না পারে? যদিই সে তুলি ফেলিয়া কলম তুলিয়া লয়? মূর্ত্তি ফেলিয়া জীবনের মুহূর্ত্তকে সংসারের মায়াজালে নিক্ষেপ করে? করে করুক। হয়তো জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সংসারকাম্য স্বাচ্ছন্দ্যে সে প্রচুরতর শান্তি লাভ করিবে। এই সব খেয়াল বা স্বপ্ন জীবনকে পূর্ণ করিয়া রাখে বটে, কিন্তু বাস্তবের সংস্পর্শে প্রতি পদে পায় আঘাত। ভঙ্গুর কাচের মতই টুকরাগুলি বুকে আসিয়া বিঁধে—রক্তাক্ত করে হৃদয়।

অধ্যাপক রায় অকস্মাৎ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। শহর নহে, গ্রাম। রাত্রির অন্ধকার নহে, আধ-প্রকাশিত উষার অস্পষ্টতায় তিনি সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া বহুদিনকার সর্পিল পথটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং কখন এক সময়ে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বালিভরা সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে ঘন আসশ্যাওড়ার বন। বনের মাথা সাদা ফুলের কুঁড়িতে ভরা, মুঠা মুঠা ভাজা-চাল কে যেন ছড়াইয়া দিয়াছে। কটু গন্ধ, নিশ্বাস টানিলেই বুকের ভিতর চলিয়া যাইতেছে। বেশ ঠাণ্ডা গা-জুড়ানো হাওয়া। তারপরেই আমবাগান, তলায় ভাঁটের বন—অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। দোয়েল ডাকিতেছে। কোন্ মাস কে জানে, মুকুলগন্ধে আমবাগান মাতাল হইয়াছে; যে তাহার

তলা দিয়া হাঁটে সেই মত্ততা তাহাকেও যেন পাইয়া বসে। বৎসরের সেরা ঋতুগুলি যেন একসঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, চঞ্চল বালক তাহারই ভিতর দিয়া ছুটিতেছে। আমবাগান পার হইয়া মাঠ, শ্যামল শস্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ, বায়ুতরঙ্গে লীলাপ্রমত্ত। আকাশের নীলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বন্ধন তার সঙ্কেতময়। তারপরেই অনাড়ম্বর সেই কুটীর, প্রাঙ্গণে ফুলে ভরা সজিনাগাছ, উঁচু দাওয়ায় সেই চক্রযন্ত্র। যন্ত্র ঘুরিতেছে। কুমোর নাই, আপনিই ঘুরিতেছে, ও হাঁড়ি সরা তেমনই গড়িয়া উঠিতেছে। দাওয়ায় পড়িয়া আছে কয়েকটা পুতুল। নির্ম্মল আসিয়া আগড়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছে। কঞ্চির আগড়, তালাচাবি দিয়া আটকানো নহে, একটু ঠেলিলেই খুলিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্য! দুই হাতের প্রাণপণ ঠেলাতেও আগড় খুলিল না। পরিশ্রমে মুখ রাঙা হইয়াছে, হাতের পেশী থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, আগড় কেন খোলে না?

আরও জোরে ঠেলিতেই হঠাৎ তন্দ্রা টুটিয়া গেল। চোখ চাহিতেই দেখেন, ঘামে সারা দেহ ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানায় তিনি হাঁপাইতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। তথাপি গ্রামের পথ, বনের গন্ধ ও শস্যের শ্যামলতা মন হইতে মুছিয়া গেল না। এমন কি, সেই কঞ্চির আগড়টা পর্য্যন্ত সম্মুখে কঠিন দেহ মেলিয়া পথরোধ করিয়া আছে। ওপারে ফুলে ভরা প্রাঙ্গণ, আলোর রেখাটি ঘন অন্ধকারে নিবিয়া আসিতেছে, নিশ্চিহ্ন হয় নাই। এখনই ঘন তিমির মাখিয়া রাত্রি আসিবে, কোথায়ও কিছু নজরে পড়িবে না।

তাড়াতাড়ি তিনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিলেন এবং আলো না জ্বালিয়াই নীচে নামিতে লাগিলেন।

টেবিলের উপর মূর্ত্তিগুলি তেমনই সাজানো, তলায় তাহাদের কাগজ চাপা। কোনটায় লাল পেন্সিলের ক্রস-চিহ্ন, কোনটায় কালো পেন্সিলের স্বাক্ষর। তিনিই অসাফল্যের দাগ টানিয়া ওইগুলির ভাগ্য নির্ণীত করিয়াছেন।

ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া অধ্যাপক রায়ের বুক মমতায় ভরিয়া উঠিল। বিচারের ভান করিয়া তিনি কেন আশা ও আনন্দে ভরা হৃদয়গুলি ভাঙিয়া দেন? যে বদ্ধ অর্গল তাঁহার জীবনকে পৃথক করিয়া সম্পূর্ণ এক স্বতন্ত্র জগতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে, সে জগতে আসিয়া আর কেহ যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে, এ যেন অসহ্য।

হাত বাড়াইয়া তিনি প্রত্যেক মূর্ত্তির পদপ্রান্ত হইতে লাল পেন্সিলের ক্রস-চিহ্ন দেওয়া কাগজগুলি টানিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে কাগজের প্যাড টানিয়া লিখিলেন।

সে লেখা আমরা এই কাহিনীর প্রারম্ভেই পাঠ করিয়াছি।

অপূর্ণ

বাবা-মায়ের বড় আদরের ছেলে ছিল রতন। ছেলেবেলায় কি করিয়া কাপড়ে আগুন লাগিয়া তাহার সারা দেহের সঙ্গে মুখখানি পুড়িয়া যায়। ডাক্তারী চিকিৎসার গুণে কালে সর্ব্বাঙ্গের দুরারোগ্য ক্ষত মিলাইয়া গেল, শুধু চক্ষু দুইটিতে দুর্ঘটনা তাহার স্মৃতি-চিহ্ন রাখিয়া দিল। দৃষ্টি একেবারে নিবিয়া যায় নাই। স্বল্প আলোকে আকাশের নীলিমা, বনের শ্যামলতা ও লোকের মুখগুলি দেখিয়া চিনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল।

বাবা-মায়ের আরও দুইটি সন্তান হয়। তাহারা কর্ম্মক্ষম, সবল, সুস্থ। কাজেই, এই অঙ্গহীন রুগ্নটির [illegible] তাঁহাদের মমতা কিছু অত্যধিক পরিমাণেই ছিল।

অর্থও তাঁহাদের কিছু ছিল। ভাবিয়াছিলেন, মরণকালে অক্ষম সন্তানের যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া দিয়া যাইবেন। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল ধীরেসুস্থে তাঁহাদের সে ব্যবস্থা করিতে দিল না। রতনের তিন বৎসর বয়সের সময় বারো ঘণ্টার কাল-ব্যাধিতে মা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় স্বামীর হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া মিনতি-ভরা কণ্ঠে কহিলেন, ওকে দেখ।

তারপর, বারো বৎসর ধরিয়া মৃতা পত্নীর শেষ অনুরোধ পালন করিয়া পিতাও একদিন সেই অজানা-লোকে প্রয়াণ করিলেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং কিছুই বলিতে পারিলেন না। একবার রোদনক্ষুব্ধ রতনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মেজছেলে ভূষণের পানে চাহিয়া কি যেন ইঙ্গিত করিতে গিয়াছিলেন, স্বর বাহির হয় নাই—কণ্ঠটা ঘড়ঘড় করিয়া চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিয়াছিল। কিছুই বলা হয় নাই।

ভূষণ সে ইঙ্গিত বুঝিয়াছিল কিনা বলা যায় না; তবে সস্নেহে অবোধ পিতৃহারা ভাইটির মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিয়াছিল, তোর ভাবনা কি রতন, যখন আমরা রয়েছি!

রতন শুধু কাঁদিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে দুই দাদার পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ছিল না বলিয়াই হয়তো তাঁহাদের আকুলভাবে কাঁদাইতে পারে নাই। তা না পারুক, সকলের হৃদয় তো সমান নহে। কেহ স্নেহমায়ামমতাশীল, কেহ বা সংসারের উপযোগী কিছু কঠিন।

রতনের বয়স তখন পাঁ[illegible] —কৈশো[illegible]র-যৌবনের সন্ধিস্থল। আপনার সৌন্দর্য্যহীন ইন্দ্রিয়ের [illegible]নেই তাহার আক্ষেপ বেশি হইয়া উঠিয়াছিল। ধরণী রূপ-র[illegible] গন্ধময়ী, প্রকৃতি নব নব ঋতুর বিকাশে নৃত্য-চঞ্চলা। আকাশ, নদী, প্রান্তর, পথ জীবনের নবীন আকাঙ্ক্ষায় সবেমাত্র হিরণবরণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। সূর্য্য দিতেছেন প্রচুর উজ্জ্বল কিরণ, রাত্রিতে চন্দ্র জ্যোৎস্নার বানে আকাশ ভাসাইতেছেন। কুসুম-গন্ধ বহিয়া বায়ু অঙ্গ ছুঁইয়া বিহ্বল সন্ধ্যার রাগিণী-ঝঙ্কার তুলিতেছে। এমন দিনে কোথায় খোলা মাঠে মুক্ত আকাশতলে নদীর তটপথে চিন্তালেশশূন্য হইয়া নব আনন্দের অমৃতধারা বিলাইয়া ছুটাছুটি করিবে, না ম্রিয়মাণ রতন ধীরে ধীরে বক্র পথটিতে আসিয়া ম্লান দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ পানে চায়। আকাশের ভাষা সে পড়িতে পারে না, বায়ুর ব্যাকুলতা

বুঝে না, ঋতু-উৎসবে সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পায় না—শুধু অর্দ্ধ-বিকশিত নেত্রে ঊর্দ্ধপানে করুণভাবে চাহিয়া কাহাকে নালিশ জানায়। হয়তো ভাবে, কেন তাহার দৃষ্টির প্রসার আরও বাড়ে নাই? কেন চাহনির তীব্রতা নাই? ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা ছায়ায় অঙ্গ ঢাকিয়া কেন তাহার সম্মুখ দিয়া অর্দ্ধ-অচেতনে চলিয়া যায়?

বড়ভাই বলেন, হ্যাঁরে, বইখাতা নিয়ে কি করতে রোজ রোজ স্কুলে যাস? তার চেয়ে কিছু কাজ শেখ—ক'রে খেতে পারবি।

রতন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে তাকায়। দৃষ্টিব তীক্ষ্ণতা থাকিলে তিনি দ্বিতীয় বার ও-কথা উচ্চারণ করিতে পারিতেন না।

সহপাঠীরা বলে, কান্নার আবার বিদ্যে! ফুটো কলসিতে জল!

রতন মনে মনে রাগে, উত্তর দেয় না। চোখের পরদায় যাহা পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয় না, মনের আয়নায় তাহা নির্ম্মলভাবে ফুটিয়া উঠে। একটি অঙ্গ তাহার নাই, সে জন্য অপরাধ কি তাহার?

কিন্তু নিষ্ঠুর সহপাঠীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বুঝাইয়া দেয়, অঙ্গহীনের অপরাধ কত গুরুতর। উহাদের চঞ্চল উল্লাসও তাই তাহার সারা অঙ্গে আগুন ধরাইয়া দেয়।

জগতে সবাই ইহাকে কৃপার চক্ষে দেখে, সমবেদনা জানায়। রতন ঘৃণা সহিতে পারে, কিন্তু করুণার অজস্র ধারায় মন তাহার হাঁপাইয়া উঠে। বিধাতা যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার নালিশ পৃথিবীর আদালতে নাই। কেন এই অবুঝ লোকগুলা বুঝে না? অথবা বুঝিয়াও মর্ম্মব্যথায় প্রলেপ মাখাইতে গিয়া খানিকটা খোঁচা লাগাইয়া দেয়।

মলিনা কোন কথা বলে না। চুপ করিয়া তাহার কাছটিতে বসিয়া এ-বাড়ির ও-বাড়ির খবর দেয়। রতনকে কত আশ্চর্য্য কথা বলি হাসায়।

রতনের চেয়ে বয়সে সে অনেক ছোট। মনটি তাহার ভারি সাদা। তাহাদের ক্ষুদ্র গ্রামের অনেক খবরই প্রত্যহ সে রতনকে দিত। রতন নীরবে শুনিয়া কখনও বা অতি সংক্ষিপ্ত দুই একটি মন্তব্য প্রকাশ করিত।

সেদিন মলিনা রতনকে বলিল, ছোড়দা, আজ একটা খবর শুনে এলাম।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, কি খবর রে?

এদিক ওদিক চাহিয়া মলিনা বলিল, বড়বউদি শুনতে পাবে এদিকে এস, তোমায় বলছি।

বাড়ির পিছনে খানিকটা পতিত জমি ছিল। গোটাকয়েক আম বেল ও নিম গাছ সেখানে ছিল। ফল হয় না, তবু তাহারা বাগানের শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। রতনের পিতার আমলে গাছগুলি কয়েকবার ফলিয়াছিল। দুই তিন বৎসর হইতে আর মুকুল ধরে না।

গাছ কয়টি রতনের বড় প্রিয়। কতদিন সকালে ও দুপুরে সে একা এই গাছগুলির তলায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কোনটির গায়ে মাথা রাখিয়া, কোনটিতে বা পিঠ চাপিয়া আপন মনে খেলা করিত। কোনটির তলায় নোনা আতার পাতার ছাউনি দিয়া ছোট কুটীর বাঁধিয়া একা একা গৃহসুখের কল্পনায় বিভোর হইত।

ফজলি, কাঁচা-মিঠে, জোয়ানে, ক্ষীরপুলি, পাটালি, দুধে এমনই কত কি নামকরণ করিয়াছিল গাছগুলির। আম একটারও ভাল ছিল না লোকে নাম শুনিয়া চক্ষু নাসা কুঞ্চিত করিয়া কহিত, কানা পুতের নাম পদ্মলোচন। সে কথা রতনকে আঘাত করিত। তাই সে নীরবে

ইহাদের সাহচর্য্যে আপনার মনের ব্যথা দূর করিতে প্রয়াস করিত। গাছেরা কথা কহে না, কিন্তু পাতা নাড়িয়া কত কি বলে। মধ্যাহ্নবায়ু-তাড়িত মৃদু পত্র-মর্ম্মর-ধ্বনিটুকু রতনের কানে সঙ্গীতের সুরে বাজিতে থাকে। প্রভাতের মিষ্ট হাওয়া তাহাকে সখার মত স্নেহস্পর্শ জানায়। অপরাহ্ণে রক্তরবির শেষ কিরণরেখা গাছের মাথা লাল করিয়া ঘরে ফিরিবার ইঙ্গিত জানায়। সুখে দুঃখে ইহারাই তাহার একমাত্র নর্ম্মসখা।

মলিনা আসিয়া হেলানো ক্ষীরপুলি গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, রতন আর একটু উপরের ডালে পা দুইখানি ঝুলাইয়া বসিল। কহিল, কি কথা রে?

ভুবনদা যে বৌদিকে নিয়ে কলকাতায় চলল!

ভুবন রতনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। সংসারে তাহার উপার্জ্জনই বেশি। সম্প্রতি একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে এবং বধূও পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যয়সঙ্কোচে মন দিয়াছে। এখানে থাকিলে অনাবশ্যক খরচের ভার বৃদ্ধি হয়, চাকুরির স্থলে স্বামীও খাওয়া-পরার যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং সব দিক ভাবিয়া কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়। স্বামীর কষ্ট দূরীকরণার্থে সে এই সৎপরামর্শ দিয়াছিল।

ভুবন অবুঝ হইয়া প্রথমটা আপত্তি করিয়াছিল, কানা ভাইটার কি হবে?

স্ত্রী বলিয়াছিল, তোমায় যে একাই সব করতে হবে তার মানে কি? মেজঠাকুরপো রয়েছে—কিছু দিক, তুমিও কিছু কিছু পাঠিও।

যুক্তি মন্দ নহে ভাবিয়া ভুবন সম্মতি দিয়াছিল।

কথাটা অনেকেই শুনিয়াছিল, মলিনাও জানিত। রতনকে বলা হয় নাই, কারণ, সে হয়তো কাঁদাকাটা করিতে পারে।

শুনিয়া রতন বিশ্বাস করিল না।

কহিল, দূর, কলকাতায় কোথায় গিয়ে থাকবে ?

মলিনা মাথা নাড়িয়া বলিল, দূর বই কি! যখন যাবে, দেখতেই পাবে। বলছিল, একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেইখানে থাকবে।

রতনের মুখখানি শুকাইয়া গেল।

সে বড় হইয়াছে। নিজের সমস্যা যে না বুঝিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু একটি পয়সা সে উপার্জ্জন করিতে পারে না। রুগ্ন দুর্ব্বল দেহে শ্রম তাহার সয় না, তাই সে চেষ্টাও এতদিন করে নাই। আজ বড়-ভাই চলিয়া যাইতেছেন, কাল যে মেজদাও না যাইবে তাহার ঠিক কি ? তারপর, তাহার উপায় ?

মলিনা বলিল, তোমায় নাকি মাসে মাসে টাকা পাঠাবে।

শুনিয়া রতনের মুখখানি উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল, কে বললে টাকা দেবে ?

কেন, বড়বউদি কিছু দেবে বললে; মেজদাও হয়তো দিতে পারে। তা হ'লে মজা ক'রে বেশ খরচ করবে, নয় ? রোজ রোজ ফুলুরি কিনে পান্তাভাত দিয়ে খাবে।

ফুলুরির উপর মলিনার যত লোভ ছিল, রতনের তত ছিল না। আপাতত পান্তাভাত ও ফুলুরি চলিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাও মিলিবে কিনা কে বলিতে পারে!

রতন চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বলিল, আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করব বড়বউদিকে।

বালিকা হইলেও মলিনার একটু বুদ্ধি ছিল। সে ঠোঁট উল্টাইয়া কহিল, আমার কথা বিশ্বাস হ'ল না বুঝি? যাও না, ব'লে মজাটা দেখ গে না।—বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

রতন অনুনয় করিয়া তাহাকে ফিরাইল, শোন, শোন, মলিনা, তোর কথা আমি বিশ্বাস করছি।

মলিনা ফিরিল।

রতন বলিতে লাগিল, আচ্ছা মলিনা, মেজদাও যদি কলকাতায় চ'লে যায়, তখন আমার দশা কি হবে?

মলিনা টপ করিয়া জবাব দিল, কেন, তুমিও চ'লে যাবে।

রতন ম্লান হাসিয়া বলিল, কানা লোক, অত দূরে কি যেতে পারব? কে নিয়ে যাবে?

মলিনা বলিল, দূর, কানা বই কি! এই তো গাছে উঠে বসেছ, এই তো দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, কটা আঙুল নড়ছে বল দেখি?—বলিয়া পাঁচটি আঙুলই তাহার সম্মুখে নাড়িতে লাগিল।

রতন রাগ করিল না। হাসিয়া বলিল, এটুকু দেখতে পাই, কিন্তু কাজ করবার শক্তি কই? দেখছিস তো আমার চেহারা।

মলিনা তাহার গায়ে হাত রাখিয়া বলিল, তা হোক, বড়দার কাছে থেক, তোমায় কাজ করতে হবে না।

রতন কিছুতেই ইহাকে বুঝাইতে পারিল না, বড়দা তাহাকে এড়াইবার জন্যই কলিকাতায় যাইতেছেন। সে দশ বৎসরের বালিকা, বলিলেও বুঝে কই?

অবশেষে রতন বলিল, টাকা না হয় পেলাম, হাত পুড়িয়ে রাঁধব কি ক'রে?

মলিনা বলিল, ওমা, তুমি রাঁধবে কেন? তোমার বউ এসে রেঁধে দেবে।

রতন ব্যথার হাসি হাসিয়া বলিল, নিজে পাই না খেতে, আবার বউ!

মলিনা বলিল, আহা! কথার ছিরি দেখ না, বউ যেন আসবে না? বেশ গো বেশ, দেখে নিও—আমার কথা সত্যি হয় কিনা!

তাহার কথা ও হাত-নাড়ার ভঙ্গিতে রতনের মুখে হাসি ফুটিল। কহিল, পাগল কোথাকার!

মলিনা ফিসফিস করিয়া কহিল, যতদিন বউ না আসে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার ডা'ল তরকারি রেঁধে দিয়ে যাব। ভাতটা তুমি নামিও।

রতন বলিল, তুই আর কত দিনই বা আমায় রেঁধে খাওয়াবি। বিয়ে হ'লে যখন শ্বশুরবাড়ি চ'লে যাবি আমার কথা মনেও থাকবে না।

মলিনা রাগিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল, হ্যাঁ, যাবে বই কি? যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।—বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

রতন তাহার গমন-পথের পানে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তাহার বয়স হইয়াছে, সে অনেক কথাই বুঝিতে পারে।

যথাসময়ে বড়দা কলিকাতায় চলিয়া গেল। রতন কাঁদিয়া হাট বসাইল না।

বউদি দাদাকে অলক্ষ্যে বলিল, দেখলে কাঠ-প্রাণ! একরত্তি মায়া নেই গা? সাধে কি আর বলে, কানা খোঁড়ার এক গুণ বেশি!

ভুবন কোন উত্তর দিল না।

বৈকালে ভূষণ বলিল, দেখলি তো রতে, বড়দার আক্কেলখানা—বউ নিয়ে কলকাতায় পালাল!

রতন চুপ করিয়া রহিল।

ভূষণ বলিতে লাগিল, অথচ বড়ভাই ব'লে আমি একটি কথাও কই নি। বাবা মরতে না মরতে টাকাগুলো নিলে ভাগ ক'রে। নিলে—নিলে। আমি যেন রোজগার করি, কারও তোয়াক্কা রাখি না। কিন্তু তোর কথা একবার ভাবলে না? ভাবলে না, অক্ষম ভাইটা কি ক'রে খাবে?

তথাপি রতন চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সে ঈষৎ উষ্ণস্বরে বলিল, কথা কচ্ছিস না যে?

রতন বলিল, আমি কি বলব মেজদা?

ভূষণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, আমি কি বলব? কেন, বলতে পারলি না, তুমি চ'লে গেলে আমার চলবে কি ক'রে?

রতন ভাবিল, সে কথা বড়দাই কি জানিত না! মুখে বলিল, ব'লে গেছে পাঁচ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দেবে।

তাচ্ছিল্যভরে ভূষণ বলিল, পাঁচ টাকা! তাতে কি হবে? আজকালকার বাজারে চলে একটা লোকের? ধর গিয়ে এক মণ চালের দামই তিন চার টাকা। তারপর জামা কাপড়, জুতো, ছাতা, হাটবাজার—

মৃদুস্বরে রতন বলিল, বউদি বলেছে, আর আদ্দেক খরচ তুমি দেবে।

এবার ভূষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আমি দোব! বড় পয়সা আমার, নয়? চাকরি ক'রে পাই তো তিরিশটি টাকা মাইনে, হাতে মাখতেই কুলোয় না। উঃ, আক্কেলখানা দেখ একবার; কি ব'লে বললে এ কথা? চামার, চামার!

রতন কুন্ঠিত মুখে বসিয়া আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেন ভগবান আমায় সৃষ্টি করিয়াছিলে? যদি জগতের আলো

দেখাইয়াছিলে, আবার কেন তাহা হরণ করিয়া লইলে? পরের গলগ্রহ করিয়া এ জীবনকে লাঞ্ছিত করায় তোমার সৃষ্টির কি সার্থকতা হইল প্রভু? এখনও সময় আছে, মরণ দাও, মরণ দাও। মাঠের মাঝে বজ্রদগ্ধ তাল-নারিকেল তরুর মত প্রয়োজনহীন দেহটা জীয়াইয়া রাখিয়া বৃথা লোকের অবজ্ঞাভাজন করিও না। মরণ দাও।

ক্রোধের উচ্ছ্বাস থামিলে ভূষণ বলিল, তুই একখানা চিঠি লেখ। লেখ, পাঁচ টাকায় আমার চলবে না। মেজদা অক্ষম। তোমায় দিতেই হবে, না দিলে শুকিয়ে মরব। পরে আত্মগতভাবে বলিল, দেবে না, ইঃ! মার পেটের ভাই, না দিলেই হ'ল আর কি!

রতন বলিল, আমি তো লিখতে পারি না মেজদা, তুমি যদি লিখে দাও।

ভূষণ বলিল, না না, আমি লিখলে হবে না। মনে করবে, টিপ্‌নি। তুই আর কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নে। দেবে না, মাগনা আর কি! —বলিয়া উঠিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর বৎসরও ঘুরে নাই। মেজদার কথা এখনও মনে পড়ে, তোর ভাবনা কি রতন, আমরা যখন রয়েছি।

পিতা নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিয়াছিলেন। রতনও যদি অমন নিশ্চিন্ত হইতে পারিত।

সে স্থির করিল বড়দাকে পত্র দিবে না। তাঁহারা যদি অনাথ ভাইটির মুখপানে না চাহিয়া পিতার নিকট মৃত্যুকালের শপথকে এমনই লঘুভাবে উড়াইয়া দিতে পারেন, তো জগতে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? না খাইয়া সে যদি শুকাইয়া মরে তথাপি সে কোন কথা বলিবে না।

সন্ধ্যাবেলায় ভূষণ বলিল, চিঠিখানা আমায় দে। আমি পাঠিয়ে দোব।

রতন বলিল, আমি তো চিঠি লিখি নি, মেজদা।

কেন?

কি হবে লিখে? বড়দা কি নিজেই বুঝতে পারছেন না সব?

ভূষণ ব্যঙ্গস্বরে কহিল, ওঃ, ভারি তো দরদ! তাই ফেলে চ'লে গেলেন। তার কি কিছু পদার্থ আছে যে বুঝবে? বউদি যে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

অপদার্থ ভাইয়ের আচরণের ত্রুটি পদার্থবান ভাইয়ের চোখে এমনই বৃহৎ হইয়াই দেখা দেয়।

রতন কিন্তু বলিল, মাসখানেক যাক, মেজদা।

ভূষণ রাগিয়া বলিল, বেশ তাই যাক। তখন যদি পেট না ভরে তো আমার কাছে কুকুর-কান্না কেঁদ না যেন। আমি আগে থেকেই ব'লে রাখছি, কিছু দিতে পারব না।

পরদিন প্রাতঃকালে মলিনা আসিতেই রতন তাহার সম্মুখে কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, কি ক'রলে মানুষ শিগগির মরে, জ্বালাযন্ত্রণা হয় না—বলতে পারিস মলিনা?

মলিনা বলিল, ও কি কথা ছো'ড়দা?

রতন বুঝিল ইহার কাছে কাঁদা ভাল হয় নাই। সে হয়তো কিছুই বুঝিবে না, লাভে হইতে পাড়াময় এ কথা বলিয়া বেড়াইবে। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য সে বলিল, আজ কি বাঁধব বল দিকি? ঝোল ভাত, কি বলিস?

মলিনা উৎসাহভরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ তো, বড় বড় ট্যাংরা মাছ আন, খাসা ঝোল হবে।

রতন বলিল, ঝোলে কি কি মশলা দিতে হয় জানিস ?

মলিনা মুখ ঘুরাইয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল, হুঁ, মা আঁতুড়ে গেলে আমি কত দিন বাবাকে ঝোল ভাত রেঁধে খাইয়েছি। প্রথমে তরকারিগুলো ভেজে নেবে, তারপর মাছ ভাজবে। তারপর হলুদগোলা জল দেবে ঢেলে। লঙ্কা দুটো কুচিয়ে দিতে পার। একটু জিরে বাটা, ধনে বাটা, লঙ্কা বাটা—বাস্। ঝোল তো ফুটতে থাকবে। তারপর একটু ঘন হ'লেই নামাবে। তেজপাতা জিরে লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নেবে। ছ্যাঁক ক'রে শব্দ হবে। তারপর পিটুলি গুলে নামিয়ে নেবে।

রতন জিজ্ঞাসা করিল, পিটুলি কি ?

মলিনা হাসিয়া বলিল, ওমা, পিটুলি কি জান না ? ময়দাগোলা। না না, আমিই ভুল বলছি, মাছের ঝোলে পিটুলিগোলা দেয় না। ডালনায় দেয়। পার তো একটু ঘি দিও।

রতন হাসিয়া বলিল, দেখা যাক। তুই বরং দেখিয়ে দিস।

মলিনা বলিল, আচ্ছা, বাজার ক'রে আন।

রতন বলিল, বাজার আর করব না। ঘরে আলু আছে, বেগুন আছে। আজ ভোরবেলায় মেজদা কাঁচড়াপাড়ায় গেছে কিনা।

মলিনা বলিল, মাছ আনবে না ?

না। পয়সা কোথায় পাব ?

বা রে! যাবার সময় তোমার দাদা পাঁচটা টাকা দিয়ে গেল, আমি দেখি নি বুঝি ?

রতন বলিল, সে টাকায় ট্যাংরা মাছ কিনলে তো হবে না, চাল কিনতে হবে।

মলিনা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, আচ্ছা মশায়, সে হবে। এখন তো মাছ আন।

যাই।—বলিয়া রতন বঁটি পাতিয়া আলু কুটিতে বসিল। বহুকষ্টে একটির খোসা ছাড়াইয়া কুচিকুচি করিয়া কুটিতেই মলিনা হাসিয়া উঠিল।

রতন বলিল, হাসলি যে?

মলিনা ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, আহা, বাবুর আলু কোটার যা ছিরি! ওই বুঝি ঝোলের আলু কোটা হ'ল? এমনই লম্বা লম্বা চারফালা ক'রে কুটতে হবে না? সর, সর, আমি কুটছি।—বলিয়া রতনকে ঠেলিয়া দিয়া বঁটির উপর গিয়া বসিল।

রতন হাসিতে হাসিতে বলিল, তবে তুই কুটে রাখ, আমি বাজার ঘুরে আসি।

এমনই করিয়া সেদিন দুইজনে রান্না করিল।

খাইতে খাইতে রতন বলিল, সুন্দর ঝোল হয়েছে, মলিনা।

নুন ঝাল সমান হয়েছে তো?—বলিয়াই মলিনা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওই যাঃ, নুন দিতে একদম ভুল হয়ে গেছে।—বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল ও এক খামচা নুন হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, এই দেখ, উনুন পাড়ে যেমনটি রেখেছিলাম, তেমনই আছে! একবারও মনে হ'ল না, না? পোড়া কপাল আমার! নাও, ঝোলের সঙ্গে একটু মেখে নাও।

আহার শেষ হইলে মলিনা চলিয়া গেল।

রতন ভাবিতে লাগিল, এই তো সবে আরম্ভ! এখনও কত দিন

এমন করিয়া কাটাইতে হইবে, কে জানে? মলিনা ছেলেমানুষ, মনটি উহার সাদা। জানেও কিছু কিছু। কিন্তু কত কাল আর সে এই ভাবে যাওয়া আসা করিবে? একটু বড় হইলেই বুঝিবে, কানার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই উচিত। জগতে বিধাতা যাহার কোন মূল্যই নির্দ্ধারণ করিয়া দেন নাই, তাহার সঙ্গে সুখদুঃখের সম্পর্ক পাতাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দান করিয়া পাইবার প্রত্যাশা না থাকিলে, দানের সুখ কোথায়? আপনার সুখ যেখানে, স্বার্থ সেইখানে। মানুষ জ্ঞানে অজ্ঞানে এই সুখকেই কামনা করিয়া থাকে। রতন নিজেই কি নিজের স্বাচ্ছন্দ্য চাহে না?

শনিবারে ভূষণ বাড়ি আসিয়া বলিল, বাবার পুরোনো আলমারিটা মাঝের ঘরে আছে বুঝি?

রতন বলিল, হাঁ।

ভূষণ ঘর খুলিয়া দেখিল, ধূলি আবর্জ্জনায় ঘর ভর্ত্তি। আলমারির পালিশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেখিয়া রতনের পৃষ্ঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল, ভূত কোথাকার! যেমন নিজে বাঁদর, তেমনই ঘরদোর-গুলো নোংরা ক'রে রেখেছ! পয়সার জিনিসটা একেবারে মাটি করেছ!

রতনের শীর্ণ দেহ সে আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল। অতিকষ্টে দুয়ার চাপিয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, উঃ!

ভূষণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া আলমারির ধূলা ঝাড়িতে লাগিল।

রবিবারে খরিদ্দার আসিল, আলমারিটা বিক্রয় হইয়া গেল।

রতনকে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া ভূষণ বলিল, এই নে এক টাকা। বড়দা এসে জিজ্ঞেস করলে বলবি, জানি না।

রতন সবিস্ময়ে মেজদার পানে চাহিয়া বলিল, বড়দার টাকা পাঠিয়ে দেবে না?

ভূষণ হাসিয়া উঠিল। কহিল, আমি ভাবতাম ন্যাকা-বোকা! ও হরি! কানার পেটে পেটে এত! ভাগের বেলায় তো জ্ঞান টনটনে! না, দোব না। সে যখন চ'লে গেল, আমাদের কথা ভেবেছিল কি? নিজে তো বিয়ে ক'রে দিন কিনেছে। ভেবেছিল কি, আর দুটো ভাই আছে, তাদের মানুষ করতে হবে, সংসারী করতে হবে? আমার বাবার জিনিস বেচব, ভাঙব, যা ইচ্ছে করব। কে কি করতে পারে, করুক।

রতন ভয়ে আর কোন কথা কহিল না। তার যত পরামর্শ মলিনার সঙ্গে। পরদিন সে আসিলে কহিল, মলিনা, মেজদা তো আলমারি বেচে টাকা নিয়ে গেল। কি করি বল দেখি? দাদাকে জানাব?

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় ক টাকা দিলে?

এক টাকা।

ঠোঁট উল্টাইয়া মলিনা বলিল, মোটে এক টাকা! না বাপু, তুমি বড় বোকা, আর চাইতে পারলে না?

চাইব কি, বড়দার কথা বলতেই মেজদা আমায় মারতে এল!

মলিনা মুখখানি গম্ভীর করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। পরে অকস্মাৎ করতালি দিয়া কহিল, বেশ হয়েছে। চার পয়সার পাঁপর ভাজা কিনে আন, আজ রথের দিন মজাসে খাওয়া যাবে।

এত বড় সমস্যার সমাধান এমন সহজে যে মলিনা করিয়া দিবে তাহা রতন ভাবে নাই।

সে হাসিয়া বলিল, এই জন্যেই তো তোর সঙ্গে পরামর্শ করি। আমার ভাবনা-চিন্তাগুলো তোর পরামর্শ পেলে একদম কোথায় মিলিয়ে যায়!

এমনই করিয়া দুইটি বৎসর চলিয়া গেল।

বড়দা আর বাড়ি আসে নাই। মেজদা মাঝে মাঝে কাঁচড়াপাড়া হইতে আসে, আলমারি, খাট, সিন্দুক প্রভৃতি এক একটি জিনিস বেচিয়া কিছুদিনের মত গা-ঢাকা দেয়। রতন কখনও বা টাকাটা সিকেটা পায়, কখনও বা কিছুই পায় না। ভূষণ প্রতিবারেই বড়ভাইয়ের নিন্দা করে, ছোটভাইয়ের উপর করুণা দেখায়। কিন্তু সে ওই পর্য্যন্তই। তাহার নিন্দা-সুখ্যাতিতে কাহারও কিছু যায় আসে না।

মলিনা আর তত ঘন ঘন আসে না। রান্না সে নিজেই একরকমে চালাইয়া লয়। পরামর্শ লওয়ার ব্যাঘাত আজকাল কিছু কিছু হয়। মলিনার কেমন যেন একটা লজ্জা-সঙ্কোচ আসিয়াছে। আগের মত হিহি করিয়া অকারণে হাসে না, নাচিয়া ছুটিয়া বেড়ায় না, বা রতনের পিঠে হাত রাখিয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ির গল্পও করে না। মনটি তাহার আগের মতই সাদা আর দরদে ভরা, তবু রতনের মনে হয়, সে যেন অনেক বদলাইয়া গিয়াছে।

রতন কি নিজেই বদলায় নাই? খাওয়া-পরার কষ্ট তাহার কষ্ট বলিয়াই মনে হয় না। আপন নষ্ট অঙ্গটি ফিরিয়া পাইতে সে সারা জীবন উপবাসে কাটাইয়া দিতে পারে, মনে হয়। লোকের বিদ্রূপ বড় তীব্র হইয়া বুকে বাজে।

অভাব বাহিরের না হইয়া অন্তরের হইলে, ইচ্ছা হয়, দুর্ব্বহ জীবনের

বোঝা নামাইয়া রাখিয়া কোথাও ছুটিয়া পলাই, নির্জ্জনে বসিয়া খানিক কাঁদি।

অঙ্গহীন অক্ষম সে; তবু যৌবন আসিয়াছে। অৰ্দ্ধস্ফুট কামনা-কুবলয় ধরণীর শোভা-হাসি-সলিলে প্রস্ফুটিত হইতে চাহিতেছে। কিন্তু সে প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ বহিয়া ফিরিবে যে মত্ত আনন্দ-বায়ু, সে তো চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করে না! চঞ্চল পদ তাহার বিষাদ বালুকায় মগ্ন হইয়া যায়, দুরন্ত জীবন-স্রোত ব্যর্থ হাহাকারে হৃদয়ের রুদ্ধ তটে আছাড় খাইয়া পড়ে। সে অক্ষম, সে দুর্ব্বল, সে ঘৃণিত।

মলিনাকে ঘিরিয়াই সে কত স্বপ্ন না রচনা করে!

জন্ম-জন্মান্তরের বাঁধন সে মানে।

শুভক্ষণে মলিনা তাহাকে দেখা দিয়াছিল। ব্যথার ব্যথী, দরদী, সুকোমলা এই বালিকার মনং বলিয়া একটা জিনিস আছে; এবং সেই মন বিশ্বের অসহায় ঘৃণিত দুর্ব্বলের ব্যথায় সমব্যথাতুর হইয়া উঠে। অল্প বয়স হইলে কি হয়, দুইটি নিপুণ করের স্পর্শে পরিপাটি কর্ম্মগুলি শৃঙ্খলিত হইয়া বাহিরে আসে। সে কর্ম্ম দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। সংসারকে সুচারুরূপে চালাইবার ক্ষমতা তাহার আছে। যে সংসারে এ লক্ষ্মীর পদার্পণ হইবে, নিরন্ন দরিদ্রের কুটির হইলেও তাহা লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়া উঠিবে। রতনের বুক ঠেলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হয়।

সে যদি কর্ম্মক্ষম হইত তো অমনই এক গৃহলক্ষ্মী তাহার ঘরখানিকে পরিপাটিরূপে সাজাইয়া রাখিত। পরিষ্কার তুলসীমঞ্চ, সন্ধ্যাবেলায় তাহাতে স্নিগ্ধ প্রদীপটি জ্বালিয়া একটি ভক্তিনির্ব্বাক প্রণাম-নিবেদন, প্রত্যুষে উঠিয়া পাট-ঝাঁট সারিয়া রান্নার উদ্যোগ আয়োজনে মাতিয়া থাকা, দ্বিপ্রহরে গরমের দিনে ঠাণ্ডা মেজেয় চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আরাম উপভোগ করা, শীতে তপ্ত রৌদ্রে পিঠ পাতিয়া বসা, অপরাহ্ণে পুষ্করিণীতে

জল আনিতে যাইবার কালে সহচরীর কানে কানে গৃহস্থালীর তুচ্ছ সুখ-দুঃখের গল্প এবং সময়-অসময়ে সেসব কথা লইয়া হাসি-তামাসা —যেন জীবনের পরিপূর্ণতার একটা দিক।

রতনের চেয়ে কত দরিদ্র আছে, যাহাদের পেট দুইবেলা ভাল করিয়া ভরে না। পরনে শতচ্ছিন্ন গ্রন্থি-দেওয়া কাপড়, ভগ্ন চালার ফাঁকে ফাঁকে রৌদ্রবৃষ্টির উৎপাত লাগিয়াই আছে, তবু তাহাদের মুখের হাসিটুকু একেবারে লুপ্ত হয় নাই। হউক ভগ্ন গৃহ, শ্রীভ্রষ্ট সংসার, সেখানকার সুর বাঁধিয়া যিনি এমন অহরহ হৃদয়-তারে ঝঙ্কার দিতেছেন, তাঁহার হৃদয়ের সুকোমল স্পর্শে বাহিরের দুঃখ অসঙ্গতি বাহিরেই পড়িয়া থাকে, সেই দরদীকে জানিবার জন্য একটা প্রবল বাসনা আজকাল তাহার চিত্তকে প্রতিনিয়ত আকুল হইয়া দোলা দিতে থাকে।

ওমা গো! ডাল যে ধ'রে পুড়ে দুর্গন্ধ বেরিয়েছে। ব'সে ব'সে কি ভাবছ, ছোড়দা?—বলিয়া মলিনা আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিল।

সচকিতে মলিনার পানে চাহিয়া রতন ডালের কড়াখানা নামাইয়া লইল ও তাহাতে এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া কহিল, আর এ বিড়ম্বনা সহ্য হয় না।

মলিনা বলিল, আজ হঠাৎ এ বৈরাগ্য কেন?

রতন হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, সংসার আমার কোথায় যে, বৈরাগ্য! তা নয়, রোজ রোজ একঘেয়ে রান্না খাওয়া, অভাব-দুঃখ, জীবনে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

মলিনা বলিল, তা কি করবে বল, ভায়েরা যে যার বউ নিয়ে চ'লে গেল। তোমার এ ছাড়া উপায় কি?

রতন ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, আমিও তো বিয়ে করতে পারি।

বছর দুই পূর্ব্বে হইলে মলিনা হাততালি দিয়া হাসিয়া বলিত,

তা হ'লে বেশ মজা হবে ছোড়দা, তুমি বিয়ে কর। কিন্তু এখন বয়সের সঙ্গে বিজ্ঞতাও বাড়িয়াছে। সে কথা কি বলা যায়?

ঈষৎ হাসিয়া সে মুখখানা নীচু করিল।

তাহার হাসি দেখিয়া রতন মনে করিল, মলিনা কথাটা উপহাসের ভাবিল। মনে মনে তাহার রাগ হইল।

ঈষৎ ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, হাসছিস যে বড়? দেখিস, ছ মাসের মধ্যে বিয়ে করি কিনা?

এ কথায় মলিনা একটু বেশি করিয়াই হাসিল।

মৃদুস্বরে কহিল, কে তোমার বিয়ে দেবে ছোড়দা?

রতন ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, যেই দিক না, বিয়ে হ'লেই তো হ'ল!

মলিনা বলিল, তা হ'লে তো আমি বাঁচি।

রতনের ক্রোধ চলিয়া গেল। ব্যগ্রভাবে কহিল, কেন, কেন?

মলিনা বলিল, কেন আবার! যে আনাড়ী তুমি, দু বছরের মধ্যে হাত ঠিক হ'ল না। বউটি এলে পোড়া ভাত ডাল আর খেতে হবে না। আমিও এটা ক'র না, ওটা কর—এই সব ব'লে দেবার দায় থেকে বাঁচব।

অকস্মাৎ রতনের মাথায় কি দুর্ব্বুদ্ধি চাপিল। ফস করিয়া বলিয়া ফেলিল, তুই কেন আয় না মলিনা, দুজনে বেশ মনের সুখে ঘরকন্না করি।

মলিনা রাঙা হইয়া কহিল, ধ্যেৎ! কি যে বল? তোমার একটুও বুদ্ধিসুদ্ধি নেই।—বলিয়া আর সেখানে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইল না।

রতন সবিস্ময়ে ভাবিল, মলিনা এই কথায় চলিয়া গেল কেন? কথাটা কি এমনই অসম্ভব? সে কি মানুষ নহে, না, তাহার দেহে রক্ত-মাংস-ভরা জীবন নাই?

ভাবিল, লজ্জার রক্তরাগে মলিনা অমন রাঙা হইয়া উঠিল, না, ঘৃণায় অমন দেখাইল? ঘৃণাই হয়তো! কানাকে লইয়া সারা জীবন ঘর করিবার কল্পনা কোন্ সুস্থ নারীই বা করিতে পারে? মলিনার মনে দয়া আছে। তাই সে অক্ষমকে সাহায্য করিতে যখন তখন ছুটিয়া আসে, দুঃখে সমবেদনা জানায়। সে দরদকে ভালবাসা মনে করিয়া আকাশ-কুসুম রচনা! বাতুলতা ছাড়া আর কি! তাহার অন্ধ জীবনের আলো চিরদিনই অনুজ্জ্বল থাকিবে। বাসনা-প্রদীপে আশার তৈল ঢালিয়া কেন তাহাকে উজ্জ্বল করিবার ব্যর্থ প্রয়াস?

পরদিন মলিনা আসিল না।

রতনের কেমন যেন সব ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিল। নিজের উপর রাগ হইল, কেন সে অমন কথা বলিতে গেল? এবার দেখা হইলে, মলিনাকে সে দুঃখ করিতে বারণ করিবে। বলিবে, ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলাম ওকথা। আমার কি ওসব সাজে?

এই জগৎ চক্ষুষ্মানের, কর্ম্মক্ষমের, সুস্থ সবলের। দুর্ব্বলের চিন্তা, দুর্ব্বলের সাধ কল্পনা এখানকার তীব্র স্রোতে বুদ্বুদের মত মুহূর্ত্তে ভাঙিয়া মিলাইয়া যায়।

পরদিন, আমবাগানের ধার দিয়া মলিনা কোথায় যাইতেছিল, ক্ষীরপুলি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া রতন তাহাকে ডাকিল। মলিনা আসিতেই অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, আমার ওপর রাগ করেছিস, মলিনা? পরশু সত্যিই ভারি অন্যায় কথা বলেছিলাম।

বলিতে পারিল না, তাহা নিছক পরিহাসমাত্র।

মলিনা মুখ তুলিয়া দেখিল, রতনের চোখে জল। মনটি তাহার দ্রব হইয়া গেল। নিজের আঁচল দিয়া রতনের চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে বলিল, ছি, কাঁদতে আছে!

রতন বলিল, বল, আমার ওপর তোর রাগ নেই ?

মলিনা বলিল, না নেই। কিন্তু, যখন তখন ওসব কথা বললে আমার লজ্জা করে না বুঝি ?

রতন বলিল, আমার কিন্তু লজ্জা নেই। তোর রাগ সত্যিই নেই, মলিনা ?

মলিনার হাসি পাইল। ওষ্ঠপ্রান্তে সে হাসি চাপিয়া বলিল, না গো, রাগ নেই—নেই—নেই। কথা শেষে সে হাসিয়া ফেলিল। মনের মেঘ কাটিয়া গেল।

রতন বলিল, আয়, কি কি রাঁধতে হবে তার কুটনো কুটে দিই।

নূতন মাস পড়িয়াছে, বড়দাদা খরচ পাঠায় নাই। ঘরে চাল নাই, আনাজ-পাতিও নাই। হাতের পয়সা ফুরাইয়া গিয়াছে। বড়দা তো কখনও এমন করে না। কে জানে তাহার অসুখ-বিসুখ হইয়াছে কিনা; দুইটি বৎসরের মধ্যে কখনও তো এমন হয় নাই।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রতন একখানি পত্র লিখিল। দিন দশেক পরে পত্রের উত্তর আসিল—

"এ মাসে খোকার অসুখের দরুন বেশি খরচ হওয়ায় টাকা পাঠাইতে পারিলাম না। খুব সম্ভব আগামী মাসেও কিছু দিতে পারিব না। ভূষণকে লিখিও, সে যেন দুই এক টাকা বেশি পাঠায়।"

পত্র পাইয়া রতন চোখে অন্ধকার দেখিল। হা ভগবান! মেজদা যে তাহাকে এ যাবৎ এক পয়সাও দেয় নাই, উপরন্তু ঘরের আসবাবপত্র বেচিয়া যাহা কিছু পাইয়াছে আত্মসাৎ করিয়াছে। এ খবরও তো বড়দাকে দেওয়া হয় নাই! ভাবিয়াছিল, বড়দাকে জানাইবে, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করিয়াছিল। মেজদার মাহিনা কম, অভাব বেশি।

কাজেই দেনা শোধের জন্য সখের আসবাবপত্রগুলি বেচিয়াছে; মেজদার কষ্টের কথা ভাবিয়া রতন জানাইতে পারে নাই।

কিন্তু এখন উপায়? মেজদা যে এক পয়সা দিবে না, তাহা সুনিশ্চিত। ছয় মাস সে বাড়িমুখো হয় নাই। রতন লোকের মুখে শুনিয়াছে, কাঁচড়াপাড়ার লোকো-আপিসের কোন্ এক এঞ্জিন-মিস্ত্রির কন্যাকে বিবাহ করিয়া সে শ্বশুরবাড়িতেই সংসার পাতিয়াছে। বিবাহের সময় বাড়িতেও আসে নাই, বড়দাকেও একটা সংবাদ দেয় নাই।

এখন তাহার উপায়? ভিটা আগলাইয়া অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন তো অন্য পথ নাই। আসবাবপত্রও এমন কিছু নাই, যাহা বেচিয়া মাস দুই চলিতে পারে। আর পরের কাছে শুধু-হাতে ধার চাহিতে গেলে লাঞ্ছনা ছাড়া অন্য কিছু মিলিবে কিনা সন্দেহ। এমনই তো খুচরা দু এক আনা পয়সার জন্য ক্ষান্তপিসি, বামুনদিদি, হরি ছুতোর, দীন ময়রা কত না শুনাইয়া দেয়।

অঙ্গহীনতার জন্য অনেক দিন সে মৃত্যু-কামনা করিয়াছে, কিন্তু এমন অনাহারে শুকাইয়া মরার কল্পনা সে করে নাই। দুঃখ যত মর্ম্মভেদীই হউক, কে নবীন যৌবনে অফুরন্ত কামনা বুকে লইয়া রূপে রসে পরিপূর্ণা শ্যামা বসুন্ধরার নিকট ক্ষোভ-গ্লানি-শূন্য হইয়া অকস্মাৎ বিদায় লইতে পারে!

রতন দারুণ হতাশভরে ঘরের চারিধার অনুসন্ধান করিল। নাই, নাই, কিছু নাই। নিষ্ঠুর মেজদা সমস্তই শোষণ করিয়া লইয়াছে।

সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছিল, কখন এক সময়ে মেঝের উপর তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িয়াছিল। তন্দ্রা ভাঙিলে দেখিল, মলিনা মাথায় হাত দিয়া ঠেলিতেছে। সে চোখ

চাহিতেই মলিনা বলিল, বাবা বাবা! এমন কুম্ভকর্ণের ঘুম তোমার! কখন থেকে ডাকাডাকি করছি!

রতন উঠিয়া বসিয়া মলিনার পানে চাহিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, একটু জল দিতে পারিস?

মলিনা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল ও অনতিবিলম্বে একগ্লাস জল লইয়া ফিরিয়া আসিল।

রতন একনিশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করিয়া ফেলিল।

মলিনা তাহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বলিল, মুখ শুকনো কেন ছোড়দা? অসুখ করেছে বুঝি?

রতন ঘাড় নাড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি রাঁধলে?

রতন তাড়াতাড়ি কি একটা উত্তর দিতে গিয়া থামিয়া গেল। মিথ্যা কথাটা বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। মলিনা তাহার পানে চাহিয়া বলিল, কই, বললে না তো?

রতন বলিল, আজ রাঁধি নি।

কেন?

আজ—আজ—। বলিতে গিয়া অবাধ্য অশ্রু উপচাইয়া পড়িল। হাতের উল্টা পিঠে চোখ মুছিতে মুছিতে রতন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, মলিনা, হাতে পয়সা নেই। দাদা খরচ পাঠায় নি।

মলিনার ক্ষুদ্র প্রাণটিও এই অন্ধ যুবকের অনশন-দুঃখে গলিয়া গেল। বিধাতা যাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, কেন তাহার প্রতি মানুষের এই নির্ম্মম অবহেলা!

বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না।

মলিনা ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেল এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এই নাও ছোড়দা, একটা সিকি। কাকেও ব'ল না যেন। যাও, উঠে খাবার নিয়ে এস।

রতন অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া কহিল, তুই কোথায় পেলি সিকি?

যেখানেই পাই না কেন! যাও, ওঠ আগে।

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না মলিনা, তোর ঠেঁয়ে নিলে লোকে বলবে, ছেলেমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে নিয়েছে; তা আমি পারব না।

মলিনা ঘাড় বাঁকাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, ইঃ, বললেই হ'ল আর কি! তারা কি আমায় এক পয়সা দিয়েছে? আমি জলখাবারের পয়সা থেকে না খেয়ে জমিয়েছি। নাও নাও, ওঠ, আর দেরি ক'র না।

তথাপি রতন উঠিল না। কহিল, শেষে তোর পয়সা—

এবার মলিনা সত্য সত্যই রাগিয়া উঠিল। মুখ ঘুরাইয়া কহিল, কেন, আমার পয়সা নিলে তোমার মান খোওয়া যাবে বুঝি? আপনার লোক! ভারি আমার আপনার লোক গো! ভাইটা রইল কি ম'ল একবার উঁকি দিয়ে চেয়ে দেখে না!

রতন কোন কথা কহিল না।

মলিনার মুখখানি ভারি হইয়া আসিল, চোখ দুইটি ছলছল করিতে লাগিল। অশ্রুরুদ্ধস্বরে সে কহিল, তবে আমি পর, আমার পয়সা নিলে তোমায় খাটো হ'তে হয়। তা নিও না। আমার যেমন মরণের জায়গা নেই, তাই ছুটে ছুটে আসি তোমার কাছে।—বলিয়া সে পিছন ফিরিল।

রতন উঠিয়া তাহার আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, দে তোর সিকি। পৃথিবীতে কেউ কারও আপন নয়, পরও

কেউ নয়। মলিনা, তোর দেনা আমি হয়তো জীবনে শুধতে পারব না।

মলিনা ওষ্ঠে তর্জ্জনী রাখিয়া কহিল, চুপ, আবার। যাও, জলখাবার কিনে নিয়ে এস। তারপর ঘটি বাটি থালা বাসন যা আছে বেচে মাস দুই চালাও। আপনি বাঁচলে বাবার নাম।

মলিনার কথায় রতন অকূলে কূল পাইল। তখনও খানকয়েক থালা বাটি অবশিষ্ট ছিল, বেচিলে কিছু দিন চলিতে পারে। পরের ভাবনা পরে। বড়দার তৈজসপত্র বউদিদি কলিকাতা যাইবার সময় চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। মেজদাও ভাগের অতিরিক্ত লইয়াছে। সে-ই বা কেন প্রাণ ধারণের জন্য এগুলি বিক্রয় করিবে না? বাপ-মায়ের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সে এগুলি আগলাইয়া আছে। যখন এই ভুবনেশ্বরী থালাখানিতে ভাত খায়, তখনই মনে পড়ে, মায়ের অর্দ্ধবিস্মৃত বলিরেখাঙ্কিত সৌম্য স্নেহময় মুখখানি। তিনি ভাতের সঙ্গে দুধ মাখিয়া শিশু রতনের মুখে অমৃতের গ্রাস তুলিয়া দিতেন। গ্লাসটি বাবা রথের মেলায় কিনিয়া দিয়াছিলেন। ছোট্ট পিতলের ঘটিতে বাবার প্রাত্যহিক মিছরি ভিজানো থাকিত। আর এই যে পাথরের খোরা, ইহাতে করিয়া তিনি কতদিন আমের অম্বল রাঁধিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছেন। অম্বলটা তিনি বেশি খাইতেন এবং এক দিন রাঁধিয়া দুই দিন তাহাতে চালাইতেন। ক্ষিতুরে কাঁসিখানি নাকি বড় পিসীমা শ্রীক্ষেত্রে রথ দেখিতে গিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন। ছোট পদ্মকাটা বাটিটি দুধ খাইবার জন্য তাহার মাসীমা দিয়াছিলেন। মাসী

বা পিসীমাকে রতন দেখে নাই। বাবার মুখে তাঁহাদের কথা ও এই বাটি-কাঁসির ইতিহাস শুনিয়াছে।

আজ এগুলি পেটের দায়ে বেচিতে হইবে। আজন্ম স্নেহ-বঞ্চিতের জন্য এই যে অবশিষ্ট স্নেহের সঞ্চয়, এগুলি অন্নের মূল্যে বিকাইয়া দিতে হইবে? তাহার আর কিছু নাই, তবু এগুলির পানে চাহিলে সময়ে সময়ে মনে হয়, যত বড় দুর্ভাগ্যই সে জন্মের সঙ্গে বহন করিয়া আনুক না কেন, তাহার তাপদগ্ধ জীবনের উপর একদা বর্ষাবারি স্নেহ-প্রাচুর্য্যে ঝরিয়া পড়িয়াছিল। আজ বিশ্বের অবহেলিত হইলেও সেদিন কয়টি প্রাণীর অন্তরে সে আরাধনার ধন হইয়াই ছিল। এই থালার সঙ্গে, বাটির সঙ্গে, খোরার সঙ্গে যে তাহার স্বপ্নময় সফল মুহূর্ত্তগুলি বিজড়িত রহিয়াছে! এগুলি গেলে জীবনে আর অবশিষ্ট রহিল কি?

রতন জানিত না, চলমান জগতে জড়স্মৃতির অস্তিত্ব চিরদিন থাকে না। দিন-রাত্রির সঙ্গে অণুপরমাণু প্রাণী-জগতে প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। স্থিতিশীলের জীবন এই বিশ্বের পৃষ্ঠ হইতে কালের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রতি মুহূর্ত্তে মুছিয়া যাইতেছে।

সব কয়টি জিনিস বাঁধা দিয়া আটটি টাকা সে পাইল। প্রাণ ধরিয়া বিক্রয় করিতে পারিল না, যদি কখনও হাতে টাকা আসে সর্ব্বাগ্রে সে এগুলি উদ্ধার করিয়া আনিবে।

মলিনার চার-আনা আর দেওয়া হইল না। সে চার-আনা যেন এক মহামূল্য স্মৃতি, পরিশোধ করিলে তাহার সুকুমার আয়ু নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

কিন্তু সেইদিন হইতে মলিনা আর আসে নাই। রতন মনে মনে হাঁপাইয়া উঠিল। মলিনার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে যে! ঘটি-বাটি তো বাঁধা পড়িয়াছে, ভবিষ্যতে একটা কোন রকমের পেট চালানো গোছের কাজ যদি জোটাইয়া লইতে পারে তো পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিবার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। মলিনার বাপ কোন মিলে কাজ করেন। তাঁহাকে বলিলে কিছু সুবিধা হইবে না কি?

কিন্তু সে লেখাপড়া তেমন জানে না, কোন্ মুখে কাজের কথা উত্থাপন করিবে? তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, কতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়াছ? কি উত্তর সে দিবে? গায়ে ক্ষমতাও সেরূপ নাই যে, পরিশ্রমের কাজ লইবে। আচ্ছা, মলিনাকে দিয়া যদি বলানো যায়, তবে কি লেখা-পড়ার কাজ নয় অথচ খাটুনি কম এমন কিছু একটা মেলে না? নাঃ, মলিনা বড় দুষ্ট হইতেছে। জানে, সে নহিলে রতনের একদণ্ড চলে না, কোন পরামর্শ সে কবিতে পারে না; তবু, জানিয়া শুনিয়াও সে ইচ্ছা করিয়া দেখা দিতেছে না। সাতটি দিন নহে, যেন সাতটি মাস।

রতন মলিনার খোঁজে তাহাদেব বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুয়াবে গাড়ি দাঁড়াইয়া; ভিতরে লোকজনের সমারোহ! বুঝি কোন সম্ভ্রান্ত অতিথিরা আসিয়াছেন। মলিনার ছোট ভাই একবার ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ছোট বোনটা একখানা রঙিন কাপড় পরিয়া চকিতে দুয়াবে উঁকি মারিয়া আবার নাচিতে নাচিতে ভিতবে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ভাইটি খাবারের ঠোঙা হাতে বাড়ি ঢুকিল, রতন সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ মনে বাগানের সেই হেলানো ক্ষীরপুলি গাছটার গায়ে ঠেস দিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

মলিনা কি রাগ করিয়াছে? কিন্তু সেদিন তো এমন কিছু কথা

হয় নাই, যাহাতে সে রাগ করিতে পারে। তাহাকে জল খাওয়াইয়া হাসিতে হাসিতে সে বিদায় লইয়াছিল। তবে?

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেও অন্ধকার হয় নাই। তিথিটা চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা হইবে। আমগাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কিরণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সামনের পথটায় লোক চলাচল বড়-একটা নাই। রতনের এ সকল খেয়াল ছিল না; সে আপন মনে ভাবিতে লাগিল, মলিনা আর আসে না কেন?

একটি সুমিষ্ট হাস্যধ্বনিতে তাহার চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল।—সম্মুখে মলিনা।

মলিনা যেখানে দাঁড়াইয়াছে, সেখানে পাতার ফাঁকটা কিছু বেশি। সুতরাং জ্যোৎস্নায় সবখানি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। রতন দেখিল, এ যেন আগেকার মলিনা নহে। কেশ বেণীবদ্ধ, কপালে কিসের টিপ জলজল করিতেছে; সুন্দর একখানি পেঁয়াজি রঙের শাড়ি তার পরনে। কাপড় পরিবার ধরণটিও ভারি চমৎকার। গলায় একগাছি সরু হার জ্যোৎস্নায় চিকচিক করিতেছে; কানে দুল ও হাতে চুড়ি কয়গাছি মানাইয়াছে বেশ। মুখখানি সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মত সুষমাময়। সমস্ত স্থানটি পুষ্পসার সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষীণদৃষ্টি ভরিয়া রতন মলিনার এই অপরূপ রূপ দেখিতে লাগিল।

মলিনা হাসিতেছিল। হাসিয়া বলিল, অবাক হয়ে দেখছ কি ছোড়দা? তোমায় প্রণাম করতে এলাম।—বলিয়া হেঁট হইয়া রতনের পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল। রতনের মনে হইল, কি যেন ঘটিয়াছে —যাহা আগেকার জীবনের সহজ সুন্দর গতির পরিপন্থী। মলিনা সাজিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পানে চাহিয়া প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। কেন?

শুষ্কমুখে সে কহিল, তোর ব্যাপার কি মলিনা? আর আসিস না কেন?

মলিনা মুখখানি নীচু করিয়া এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিল, পরে পরিষ্কার কণ্ঠে কহিল, আর তো আসব না ছোড়দা।

সে কণ্ঠস্বর রতনের বুকে তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মত গিয়া বিঁধিল। তেমনই শুষ্কস্বরে কহিল, কেন মলিনা?

মলিনা পুনরায় ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমি যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। স্বর অশ্রুকম্পিত।

রতন এবার যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। তথাপি সে মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, কেন মলিনা?

মলিনা ম্লান হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া কহিল, কেন? মেয়েছেলে কি চিরকাল বাপ-মার কাছে থাকে? আমায় তারা আজ আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল।

স্তম্ভিত রতনের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। এতদিনে মলিনাও তবে চলিল!

কেন চলিবে না? চলাই যে জগতের নিয়ম। সে পড়িয়া আছে বলিয়া জগৎ তো অচল, অনড় হইতে পারে না। একদৃষ্টে সে মলিনার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মলিনা কি বলিতে গিয়া মুখ নামাইল। আঁচলটা একবার যেন চোখে তুলিয়া দিল, পরে নম্রকণ্ঠে কহিল, খুব সাবধানে থেকো; ছোড়দা।

রতনের দুই চোখ বহিয়া তখন ধারা নামিয়াছে। কোন উত্তরই সে দিতে পারিল না।

মলিনা পশ্চাৎ ফিরিয়া অগ্রসর হইল।

রতনের মনে হইল, সমস্ত জগৎ—হাসি, আনন্দ, আলো লইয়া

মলিনার অনুবর্ত্তী হইয়াছে। অজস্র অন্ধকারের চাপে সে বুঝি হাঁপাইয়া মরিবে। আর্ত্তকণ্ঠে সে ডাকিল, মলিনা!

মলিনা ফিরিয়া কহিল, কি?

রতন কথা কহিতে পারে না। অনেক কথাই যে বলিবার আছে, কোন্‌টা আগে বলিবে সে! বুকের প্রচণ্ড আলোড়নে মুখের ভাষা ভাঙিয়া মিলাইয়া গেল।

মলিনা সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ছি, কাঁদছ! কেঁদ না। কি বলবে বল!

রতন সহসা যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল, আমি, আমি যদি তোকে কোন উপহার দিই, নিবি মলিনা?

মলিনা আনন্দিত হইয়া কহিল, নোব।

রতন আগ্রহভরা স্বরে কহিল, তবে বল, কি তুই ভালবাসিস?

মলিনা খানিক ভাবিল।

ভাবিয়া বলিল, আরশি একখানা।

রতন আনন্দিত হইয়া বলিল, আরশি, আর কিছু না?

না, আর কিছু নয়।

রতনের মনে পড়িল, কতদিন পান চিবাইতে চিবাইতে মলিনা আসিয়া তাহার ছোট কাচভাঙা আরশিখানায় জিব বাহির করিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ দেখিয়া আপন মনেই হাসিয়াছে। আরশি সে ভালবাসে বটে।

মুখে বলিল, বেশ, তাই দোব। কিন্তু তোর বাড়ি গিয়ে তা দিতে আমার লজ্জা করবে।

মলিনা বলিল, যেদিন আমার গায়ে-হলুদ হবে, সেই দিন সন্ধ্যে-বেলায় এই গাছতলায় এসে আমি নিজে নিয়ে যাব।

আসবি তো ?

নিশ্চয় আসব।

তারপর পাঁচ ছয় দিন গিয়াছে। রতন গাঁয়ের হাটে গিয়া একখানি ভাল লতাপাতা কাটা আরশি কিনিয়া আনিয়াছে। লোককে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কেমন জিনিস ?

কেহ বলিয়াছে, ভাল। কেহ বলিয়াছে, দামটা বড় চড়া, তোমায় ঠকিয়ে নিয়েছে।

রতন মনে মনে হাসিয়া ভাবিয়াছে, লোকসান তো জগতে আসিয়া অবধি আমি ভোগ করিতেছি। আজ যদি আনন্দের মধ্যে সে লোকসানকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি তো তাহার চেয়ে পরম লাভ আর কি আছে ?

এই আরশির মধ্যে আছে তাহার জগতের যত কিছু সফল স্বপ্ন ;— মায়ের স্নেহ, বাপের ভালবাসা, আত্মীয়স্বজনের মমতা-মাখা আশীর্ব্বাদ এবং যৌবনের কামনা-কুসুম। বাটি, থালা, গেলাস বাঁধা দিয়া যে কয়টি টাকা হাতে পাইয়াছে, তাহা হইতেই তো আজ এতবড় সম্পদ-লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

হে শৈশবের অদৃশ্য দেবদেবী ! কে জানিত তোমাদের অক্ষয় স্নেহ-আশীর্ব্বাদ এত দীর্ঘ দিন পরে ব্যর্থ জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণটিকে এমন প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে ?

উদ্দেশে রতন তাঁহাদের পায়ে বারম্বার নতি জানাইল।

শনিবার অপরাহ্ণে মেজদা বাড়ি আসিল।

রতন তখন ঘরে বসিয়া ফুলের মালা দিয়া সযত্নে আরশিখানাকে সাজাইতেছিল।

মেজদা ডাকিল, ওরে রতনা?

যাই দাদা।—বলিয়া আরশিখানা সন্তর্পণে বাক্সের উপর রাখিয়া সে বাহিরে আসিল।

মেজদার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াই ছিল। আরও রক্তবর্ণ করিয়া কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, ফেলার মুখে শুনলাম, তুই নাকি ঘরের ঘটিবাটিগুলো পর্য্যন্ত বেচে-কিনে খাচ্ছিস?

রতনের ইচ্ছা হইল বলে, তুমিও তো যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া লইয়াছ; সে শিক্ষা যদি পাইয়াই থাকি তো তোমারই কাছে পাইয়াছি। কিন্তু সে কোন কথা বলিল না।

মেজদা স্বর আর এক পর্দ্দা তুলিয়া কহিল, কিরে শূয়ার, উত্তর দিচ্ছিস না যে?

রতন কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কি করব মেজদা, বড়দা এ মাসে এক পয়সা পাঠাতে পারে নি।

তাই ব'লে জিনিসপত্তরগুলো বেচে তছনছ করতে হবে? বাবু লবাব! একটা মাস আর কষ্ট ক'রে চালাতে পার না?

তিরস্কার রতনের অঙ্গে বিঁধিল না। সে হেঁটমুখে চুপ করিয়া রহিল।

মেজদা বলিল, মর গে যা, নিজেই কষ্ট পাবি, আমার কি! তা ওই থেকে দে দিকি আমায় গোটা পাঁচেক টাকা! বড্ড দরকার।

রতন অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে কহিল, টাকা তো নেই মেজদা।

নেই? বলিস কি? এরই মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিস? খুব দুধ ঘি ওড়াচ্ছিস বুঝি?

রতন অন্তরে অন্তরে কাঁপিতে লাগিল।

মেজদা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, হুঁ বাবা, আমার কাছে মিথ্যে কথা! খোল তোর বাক্স, আমি দেখব।—বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রতন ছুটিয়া আসিয়া বাক্সের উপর বুক দিয়া পড়িয়া কাতরস্বরে কহিল, সত্যি বলছি মেজদা, কিছু নেই।

মেজদা দাঁত খিঁচাইয়া কহিল, কিছু নেই তো অমন বুক দিয়ে পড়েছিস কেন? আমি ন্যাকা, কিছু বুঝি না, নয়? সর সর, দেখি।—বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিল।

ফুলের মালা ছিঁড়িয়া গেল। রতন প্রাণপণ শক্তিতে আরশিখানা বুকে চাপিয়া ধরিল।

নিষ্ঠুর মেজদা আবার প্রাণভেদী কর্কশ হাসি হাসিল, হুঁ, বাবুর আবার সখটুকু মন্দ নয়! থালা ঘটি বেচে ফুলের মালা! কথায় বলে, 'বাইরে কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন', এ হয়েছে তাই। হুঁ হুঁ, তোমার পেটে এত! দেখি দেখি, চকচক করছে ওটা কি?—বলিয়া আবার একটা হেঁচকা টান দিল।

ক্ষীণ দুর্ব্বলদেহ রতন সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, মুখ গুঁজিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। আরশিখানা সশব্দে ভাঙিয়া গেল।

রতন মর্ম্মভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, মেজদা গো, আমার এমন সর্ব্বনাশও করলে তুমি?

কাচের টুকরা ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রতনের বুকেও আসিয়া

কতকগুলি বিঁধিয়াছে। লাল রক্তে তাহার বুকের খানিকটা ভিজিয়া উঠিল।

কিন্তু দেহের যন্ত্রণা ভুলিয়া রতন অবোধ বালকের মত ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

•

সেই সন্ধ্যাকালে মলিনা ক্ষীরপুলি গাছতলায় দাঁড়াইয়া রতনের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মৃত্যু-উৎসব

অমাবস্যার অন্ধকারভরা আষাঢের সন্ধ্যা। আকাশে নক্ষত্র নাই—চারিদিকে মেঘের ভ্রূকুটি। শহর-ঘেঁষা পাড়াগাঁ নহে, সত্যকারের বনজঙ্গলে ভরা গ্রাম। পা-পিছলানো-কাদার মধ্যে এমন রাত্রিতে যে একবার এই গ্রাম্য পথে চলিয়াছে, সে কখনও জীবনে সেই অভিজ্ঞতা ভুলিবে না। কিন্তু যাহারা প্রত্যহ বর্ষাকালে ঝড়ে ও অন্ধকারে খদ্যোতিকার মশাল পাশে রাখিয়া ঝিঁঝিপোকার ডাক শুনিতে শুনিতে দিব্য নিশ্চিন্তে নরম কাদায় পা রাখিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে এইরূপ গ্রাম্য পথে চলাফেরা করে তাহাদের কাছে এই অভিজ্ঞতার কি-ই বা মূল্য! ভূপতির বাস এমনই এক পল্লীগ্রামে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে ও পূরা অমাবস্যায় এই আবাল্য-পরিচিত পথ চলিতে তাহার কিছুমাত্রও উদ্বেগ বা আশঙ্কা দেখা যায় না; শীতকালে অদূরে জঙ্গলের মধ্যে কেউ ডাকিলে বুক তাহার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে না, ঝোপের আড়ালে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দৃষ্টি দেখিয়া সে ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়াছে বলিয়াও শুনা যায় নাই, বরং সুকৌশলে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। কত দিন গ্রীষ্মের অন্ধকার রাত্রিতে পাশে সরসর করিয়া সাপ চলিয়া গিয়াছে, হাতে তালি দিয়া সে নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়াছে। সেই নির্ভীক ভূপতি আজও পথ চলিতেছে;

আকাশে মেঘ, অমাবস্যার অন্ধকার, কিন্তু পা কাঁপে কেন? কেন পথিপার্শ্বের বৃক্ষলতার মৃদু ধ্বনি অশরীরী আত্মার নিশ্বাসপতনের মত তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে? মেঘের ভ্রূকুটিতে মন কেন ভার-ভার?

ভূপতির দিদি শুভার বড় অসুখ। ভূপতির মা নাই, বাপ নাই, অন্য কোন আত্মীয়-আত্মীয়া নাই, এই বিধবা দিদি একাধারে তাহার সব। সম্পর্কে বোন হইলেও মায়ের চেয়ে তিনি কম মহীয়সী নন। তিনি ভূপতির শৈশবকে আপন স্নেহের মহিমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন এবং যৌবনের নদীতে একখানি রঙিন পালভরা নৌকা ভাসাইবার আয়োজন করিয়াও এ যাবৎ কৃতকার্য্য হন নাই; কারণ ভূপতি অবুঝ। দিদির মনোদুঃখের চেয়ে সে নিজের বর্ত্তমান দুঃখকে বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। যিনি জীবন দিয়াছেন তিনি আহারও দেন, এই প্রবচনে তাহার প্রত্যয়ের অভাব। সাধ-আহ্লাদের কথা উঠিলে জীর্ণ চালাঘর দেখাইয়া সে দিদির চোখে জল টানিয়া আনে, আধভর্ত্তি গোলার পানে আর নিজের ছেঁড়া কাপড়ের পানে চাহিয়া হাসে, হয়তো বা দিদিকে রহস্য করিয়া বলে, পক্ষীরাজ ঘোড়া একটা পাইলে সাগরশায়িনী কন্যার মর্ম্মর-হর্ম্ম্যে গিয়া সোনার কাঠি দিয়া তাহার প্রিয়-প্রতীক্ষমান নিদ্রার পরিসমাপ্তি ঘটাইতে পারে। পরিহাসে দিদির কান্না শব্দমুখর হইলে সে ছুটিয়া অন্য কোথায়ও চলিয়া যায়।

এক তরফ হইতে এমনই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও অন্য তরফের ঔদাসীন্যের একদিন সহসা শেষ হইল। দিদি অসুখে পড়িলেন।

যখন শয্যা আশ্রয় করিলেন তখনই অসুখের গুরুত্ব বোঝা গেল। পাড়াগাঁর জ্বর এতদিন কাঁচা তেঁতুলের অম্বল আর কড়ায়ের ডালে ভিতরে ভিতরে পরিপুষ্টি লাভ করিতেছিল। স্নানের পর শীতভাবটুকু

ক্রমে কম্পে আসিয়া ঠেকিল, দিদি শয্যা লইলেন। শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রোগের উগ্র মূর্তি দেখিয়া ভূপতি ভীত হইয়া পড়িল। প্রধান অভাব—অর্থ, আনুষঙ্গিক শুশ্রূষার লোক। কে-ই বা রোগীকে ঔষধ খাওয়ায়, কে-ই বা সুস্থ ভূপতিকে ক্ষুধায় দুই মুঠা সিদ্ধ করিয়া দেয়!

কিন্তু নিজের জন্য ভূপতি ভাবে না। দিদিকে কিরূপে সুস্থ করিয়া তুলিবে এই চিন্তাই তাহার মনে প্রবল।

সুস্থ দিদি আর রুগ্ন দিদিতে কত না তফাৎ! রোগের প্রলাপে দিদির মুখে অন্য কথা নাই, শুধু ভূপতির কথা—তাহার খাওয়া, তাহার ঘুম বিশ্রাম, তাহার সুখ, তাহাকে সংসার পাতিবার অনুরোধ। রুগ্না বিধবার মুখে ভগবান নাই, আছে ভূপতির কথা। নিম্নগামী স্নেহের ধারায় ভূপতি রাত্রিদিন পরিপ্লাবিত হইতে লাগিল। সেই [illegible] তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দিদি যদি না বাঁচে?

ভাবনার কারণ আছে। এ কয় দিন চেষ্টা করিয়াও সে ভাল ডাক্তার জোগাড় করিতে পারে নাই। ছোট পাড়াগাঁ, ভাল ডাক্তার খুব বেশি না থাকিলেও সুবল ডাক্তারের মুখ চাহিয়া অনেকের বুকে অনেকখানি ভরসা জাগে। সেই সুবলকে আজ সাধিয়াও সে এদিক পানে আনিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদারের অসুখ। অসুখটা শক্ত, তাই শহর হইতে বড় ডাক্তার আসিয়াছেন। সুবল এবং আরও অন্যান্য ক্ষুদে চিকিৎসকগুলি কয় দিন হইতেই জমিদারের বৈঠকখানায় কায়েমীভাবে আশ্রয় লইয়াছে। পারিশ্রমিক মোটাই মিলিবে; না মিলিলেও গ্রামের জমিদার, সকলেরই তো দুই পাঁচ বিঘা জমিজমা আছে। সংসারী মানুষ চক্ষু মুদিয়া গীতার শ্লোক অনুসরণ করিলে বানপ্রস্থ যে অবিলম্বে করতলগত হইবে সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ, সুতরাং জমিদারের বিপদে বুক দিয়া না পড়িলে চলিবে কেন?

সুবল ডাক্তার তো স্পষ্টই বলিয়াছে, তোমার দিদির জন্য ভাবনা কি ভূপতি, বিধবা মানুষ, ওঁদের হাড় খুব টনকো। উপোস দিলে আপনিই সেরে উঠবে। আর দেখছ তো জমিদারবাবুর অবস্থা, ভোগের শরীর, রোগটাও শক্ত, এখান থেকে নড়ি কি ক'রে বল দেখি? ওঁর ভালমন্দ হ'লে সারা দেশের লোক অনাথ হবে যে!

ডাক্তারবাবুর গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া ভূপতি দ্বিতীয় কথাটি কহিতে সাহস করে নাই।

পথ চলিতে চলিতে নির্ভীক ভূপতি ঐ কথাটাই ভাবিতেছে। কুটীরবাসিনী দিদি আর গ্রামের জমিদারে কত না তফাৎ! বনপ্রান্তে ময়লা ও ছিন্ন শয্যায় দিদি তাহার শুইয়া অসহ্য রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, পাশে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই। না পড়িয়াছে এক ফোঁটা ঔষধ, বিধবা মানুষ—ঔষধ খাইতেও চাহে নাই, শুধু সকাল-সন্ধ্যায় তুলসীতলার মাটি আনিয়া সে দিদির কপালে ঠেকাইয়া দিয়াছে। তৃষ্ণার ক্ষণে দিয়াছে অল্প একটু জল। জল পান করিয়া দিদি অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়াছেন। ওদিকে জমিদারের অসুখে শহর হইতে বড় বড ডাক্তার আসিতেছে, গ্রামের গুলি তো ফাউ, দিবারাত্র লোকজনে বাড়ি ভর্ত্তি। মন্দিরে চলিতেছে পূজা, পুরোহিত-বাড়ি শান্তিস্বস্ত্যয়ন, দুষ্প্রাপ্য মাদুলি ও দৈব ঔষধ চয়নের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর-দূরান্তরে লোক ছুটিতেছে। জমিদার যদিই দেহরক্ষা করেন, নিতান্ত কপালের লেখা ছাড়া অন্য ত্রুটি হেতু কেহ ক্ষোভ প্রকাশ করিতে পারিবে না।

যাহারা গরিব তাহাদের কেন ব্যাধি হয়? মৃত্যু আসিয়া একেবারে সব জ্বালা চুকাইয়া দিলেই তো পারে!

ভূপতি বাড়ি আসিয়া দেখিল, দিদি ঘুমাইয়াছেন। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া ও-বেলার জল দেওয়া পান্তাভাত বাড়িয়া খাইতে বসিল।

খানিকটা নুন, কাঁচা লঙ্কা ও একটু তেল দিয়া পান্তাভাত খাইতে বেশ লাগে। উপরন্তু রাত্রির রান্নার হাঙ্গামা বাঁচিয়া যায়।

ভাত খাওয়া তখনও শেষ হয় নাই, সহসা একটা মিশ্র ক্রন্দনধ্বনি শোনা গেল। কান পাতিয়া ভূপতি মিনিটখানেক সেই ক্রমবর্দ্ধমান ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া বুঝিল, ধ্বনিটা জমিদার-বাড়ির দিক হইতেই আসিতেছে। নিশ্চয়ই মানুষের মিলিত উদ্যমের পরাজয় ঘটিয়াছে। খাওয়া আর হইল না।

দিদির তন্দ্রাও সেই কোলাহলে টুটিয়া গিয়াছিল। ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হ'ল রে, ভূপি ?

ভূপতি বলিল, জমিদার শশীকান্ত মারা গেলেন বোধ হয়।

দিদি ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছিল তাঁর ?

কি জানি ? অনেক ডাক্তার এসেছিল, অনেক কথাই তো বললে।

দিদি বলিলেন, আহা !

দিদির এই সহানুভূতি-প্রকাশ ভূপতির ভাল লাগিল না। যেখানে 'আহা' বলিবার অসংখ্য লোক রহিয়াছে, সেখানে অপ্রচারিত এই সহানুভূতির কতটুকু মূল্য ? কই, দিদির অসুখে কেহ তো একবার 'আহা' বলে নাই। জমিদার মরিলেন, গ্রামে হয়তো ইন্দ্রপাত হইল ; তাহার দিদি মরিলে কেহ একবার ভাল করিয়া হয়তো তাকাইয়াও দেখিবে না। হয়তো বলিবে, আহা, বিধবা বেশ গিয়াছে, থাকা মানে তো কষ্ট।

ভূপতির অন্তরের বিক্ষোভ কেহ সত্যকার অন্তর দিয়া অনুভব করিবে না।

ভূপতিদা, বাড়ি আছ ? ভূপতিদা ?

কে ?

আমি হরেন। জমিদারবাবু এই মাত্র দেহ রাখলেন। তোমাকেও যে যেতে হবে!

আমার বাড়িতে অসুখ যে।

বাঃ রে! আমরা মনে করেছি সংকীর্ত্তনের দল বার করব। তুমি না গেলে মূল গায়েন হবে কে?

কেন, সন্তোষ পারবে না?

রাম বল, ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো! বেলেডাঙা থেকে নেড়া বৈরাগীর দল আসছে, তাদের ওপর টেক্কা দিতে হবে।

ভূপতি অল্প একটু ভাবিয়া বলিল, না হয় তারাই গাইলে, আমাদের দল যদি না-ই বেরোয়, তাতে ক্ষতিটা কি?

কি যে বল ভূপতিদা, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে? আমাদের গাঁয়ের জমিদার, আমরা গাইব না তো কি ওরা গাইবে? তা হ'লে এতদিন দল রাখার মানেটা কি? নাও, চল।

হাত ধরিয়া টানিতেই ভূপতি বলিল, দাঁড়া, দিদিকে বলি।

কই দিদি?—বলিয়া হরেন নিজেই দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে মুখ বাড়াইয়া বলিল, জমিদারবাবু এই মাত্র মারা গেলেন, দিদি। আমাদের ভূপতিদাকে যে চাই, নইলে কের্ত্তন জমবে না।

ঘরের মধ্যে ম্লান প্রদীপশিখায় স্পষ্ট কিছু দেখা যাইতেছিল না। মলিন শয্যায় মিশাইয়া শীর্ণা শুভা পড়িয়া ছিলেন, বুক পর্য্যন্ত কাঁথা দিয়া ঢাকা। ক্ষীণ স্বর শুধু সেই দিক হইতে ভাসিয়া আসিল, পর পর কটা রাতই জেগেছে, একটু সকাল সকাল ওকে পাঠিয়ে দিও তো, ভাই।

আচ্ছা।—বলিয়া ভূপতির দিকে ফিরিয়া হরেন বলিল, কদিন হ'ল দিদির অসুখ হয়েছে? বল নি তো আমাদের!

ভূপতি হাসিল, তোমাদের শোনবার ফুরসৎ ছিল কি?

হরেন আরও একটু উচ্চ হাসিয়া বলিল, তা বটে! রাজতুল্য জমিদার, আমাদের যে মরবার ফুরসৎ ছিল না।

ভূপতি দুয়ারে শিকল তুলিয়া তালা লাগাইবার উপক্রম করিতেই হরেন সবিস্ময়ে বলিল, কুলুপ দিচ্ছ যে? ওঁকে না হয় বল না, ভেতর থেকে—

সে ক্ষমতা থাকলে আমায় ও ব্যবস্থা করতে হয় কি? নাও, চল।

হরেন অল্প একটু চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, ব্যায়রামটা শক্ত তা হ'লে! তা আমাদের এতদিন—। যাই হোক, কাল থেকে উঠে প'ড়ে লাগব, দেখি ব্যাটা রোগ সারে কিনা!

ভূপতি অন্য প্রশ্ন পাড়িল, শ্মশানে কে কে যাবেন?

হরেন দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, শোন কথা! কে কে যাবেন না তাই বরং জিজ্ঞাসা কর। গ্রামের রাজা, কি রকম প্রোসেশন হবে জান? প্রথমে একদল কের্ত্তন; তারপর ধামায় ক'রে খই ছড়াতে ছড়াতে একদল লোক যাবে; বাবুর ছেলে নিজের হাতে ছড়াবেন আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি, পয়সা; তারপর খাট কাঁধে ক'রে আত্মীয়স্বজন গাঁয়ের লোক; পেছনে থাকবে আর একদল কের্ত্তন। কেমন, গ্র্যাণ্ড হবে না?

বাজনা হবে না?

দূর, মড়া নিয়ে বাজনা বাজায়?

ভূপতি হাসিল; ও, কের্ত্তনের দল যাবে। তারপর হরেন, তোমাদের আর কি কি প্রোগ্রাম?

প্রোগ্রাম! সে মেলাই। যে খাটে জমিদার মরেছেন সেই খাটে ক'রেই নিয়ে যাওয়া হবে। কলকাতায় লোক ছুটেছে ফুল আনতে। আজ তিথিটা ভাল, অমাবস্যা, কি বল হে?

ভূপতি বলিল. সে পুরোহিতমশায় ভাল বলতে পারেন। আমি ভাবছি তোমরা যে রকম আয়োজন করছ, শ্মশানে পৌঁছতেই যে সকাল হয়ে যাবে!

হরেন হাসিল, ভারি তো সকাল! সারারাত সারাদিন ব'য়ে বেড়ালেও যায়-আসে না। কেৰ্ত্তনটা তা হ'লে অষ্ট প্রহর হয়, জমে ভাল।

হরেন, কেবল জমার কথাই ভাবছ। এদিকে—

হ্যাঁ, জমার কথা হরেনই ভাবছে শুধু। চল বাবুদের বৈঠকখানায়, দেখবে সবাই ভাবছে। বাবুর ছোটছেলে কলকাতায় গেল চন্দনকাঠ আর ফুল আনতে, স্কুলের মাষ্টাররা ভাবছে পরশুই একটা শোকসভা করতে হবে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হবেন প্রেসিডেণ্ট; পণ্ডিতমশায় খাতা পেন্সিল নিয়ে সংস্কৃত শ্লোক তৈরি করতে লেগে গেছেন, হেডমাষ্টার লিখছেন ইংরেজী শোকগাথা। বাবু সেক্রেটারি ছিলেন, শুনলাম, তিন দিন স্কুল বন্ধ থাকবে, ছেলেরা শোকে কি আনন্দে লাফালাফি ছুটোছুটি করছে, নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবে। সংবাদপত্রে খবর পাঠাবার জন্য নীতিনবাবু এরই মধ্যে চারপাতা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজ শেষ করেছেন। পুরোহিত তৈরি করেছেন বৃষোৎসর্গের ফর্দ্দ, ছুতোর এই সন্ধ্যেবেলায় বাবুর বাগানে গিয়ে বেলগাছ দেখে এল। নাপিত, ধোপা, গয়লা, ময়রা সবাই বলাবলি করছে, রাজাবাবুর শ্রাদ্ধ, দানসাগরই হবে নিশ্চয়। বুনো বাগ্দীরা বলছে, কাঙালী-বিদায়ে এক সরা চিঁড়ে মুড়কি আর চারটে মণ্ডার সঙ্গে নতুন কাপড় একখানা নিশ্চয়ই মিলবে। যত দোষ বুঝি আমাদের কেৰ্ত্তনের দলটার?

ভূপতি হরেনের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, রাগ কর কেন, ভাই? গলায় জোর থাকলে আমাদের কেৰ্ত্তনের দলটারও একটা সদ্গতি

হবে বইকি। এমন দুর্লভ মরণ তো সচরাচর ঘটে না, জাঁক হবে বইকি।

চুপ কর, আমরা এসে পড়েছি।—বলিয়া হরেন ভূপতির গা টিপিল।

জমিদার-বাড়ির সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ খোলা ময়দান। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে বহু লোক আসিয়া সেখানে জুটিয়াছে। বাঁশের মাথায় বড় বড় দুইটা 'ডে-লাইট' জ্বালাইয়া টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার বহুদূরে বনসীমায় আত্মগোপন করিয়া মৃত্যু-উৎসব দেখিতেছে বুঝি! ছেলে-বুড়া স্ত্রী-পুরুষ বাকি কেহ নাই, সকলের মুখে 'হায়, হায়' রব। স্ত্রীলোকেরা তো কথায় কথায় চোখে আঁচল তুলিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা চীৎকার করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, অন্তরে বাহিরে ইহারাই শুধু অকৃত্রিম। এ গাঁয়ের কীর্ত্তনের দল ভূপতির অপেক্ষায় তৈয়ারি হইয়াই ছিল, সে আসিতেই শ্রীখোলে ঘা পড়িল, মন্দিরা বাজিয়া উঠিল, কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

জমিদার-বাড়ির ক্রন্দন-কোলাহল আর শোনা গেল না। ঘণ্টা-খানেক পরে আসিল বেলেডাঙার দল। তারপরে দুই দলে কীর্ত্তন-প্রতিযোগিতা সুরু হইল। মুহূর্ত্তের বিরাম নাই, অষ্ট প্রহর এখন হইতেই আরম্ভ হইল বুঝি!

অবশেষে জমিদারবাবুর বড়ছেলে বাহির হইয়া আসিলেন ও দুই দলের উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া কহিলেন, আপনারা একটু চুপ করুন; কারা আগে যাবেন, কারা পিছিয়ে থাকবেন ঠিক ক'রে নিন। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরুতে হবে।

তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই ম্যানেজার যজ্ঞেশ্বরবাবু বলিলেন, তা হ'লে বাবু যা বললেন সেই মত দাঁড়ান গিয়ে, অনেকটা পথ ঘুরে গঞ্জের বাজার দিয়ে যেতে হবে কিনা, কিছু জলটল খেয়ে নিন বরং।

হরেন বলিল, আমরা আগে যাব, ভূপতিদা।

বেলেডাঙার নেড়া-বৈরাগী বলিল, আমরা আগে যাব।

হরেন চোখ পাকাইয়া বলিল, ইস, আমাদের গাঁয়ের জমিদার।

বৈরাগী বলিল, আমাদেরও জমিদার।

হরেনকে একধারে টানিয়া ভূপতি মৃদুস্বরে বলিল, তুমি তো বলতে বলতে এলে, ওরা আগে যাবে, তাই যাক না।

হরেন চোখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তুমি কিছু বোঝ না, ভূপতিদা। বড়কর্ত্তার 'ভিউ' দেখলে না? পেছনে যারা থাকবে তাদের আর কেত্তন জমাতে হবে না।

মানে?

মানে—চীৎকার করতে দেবেন না, মনে মনে মিনমিন ক'রে গাইতে হবে। চীৎকারই যদি না করলাম তো ছাই কেত্তন জমবে কিসে?

হরেন আগাগোড়া জমার কথাই ভাবিতেছে, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা সহজ নহে।

ভূপতি বলিল, যাই হোক, ঝগড়া না ক'রে আপোষ ক'রে ফেল।

নেড়া-বৈরাগীর দলও বড়কর্ত্তার ইঙ্গিত বুঝিয়াছে, কীর্ত্তনের জমাট ভাব কোথায় ও-তথ্য তাহাদেরও অজ্ঞাত নহে, সুতরাং মোহড়া লইয়া গোলটা বেশ পাকিয়াই উঠিল। অবশেষে ম্যানেজার আসিয়া নিষ্পত্তি করিলেন, তোমরা গাঁয়ের লোক তোমরাই আরম্ভ কর, অর্দ্ধেক পথ গিয়ে ওদের মোহড়া দিও।

হরেন কয়েক সেকেণ্ড চিন্তাযুক্ত হইয়া বলিল, বড়গঞ্জ দিয়ে প্রোসেশন যাবে তো?

হ্যাঁ।

আরও কয়েক সেকেণ্ড ভাবিয়া হরেন বলিল, আচ্ছা, ম্যানেজারবাবু,

ওরা ভিন্ গাঁ থেকে এসেছে, ওরাই আগে যাক, শেষের মোহড়া আমরাই নোব।

গোলযোগের নিষ্পত্তি হইল।

ভূপতি হরেনকে বলিল, হঠাৎ এত উদার হ'লে যে, হরেন ?

হরেন ভূপতির কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, এ গাঁয়ে তো বনজঙ্গল, ওবা শোনাক বাঘ শিয়ালকে। গঞ্জে পৌঁছবার আগে আমাদেব মোহড়া, আমরা শোনাব যারা সমঝদার তাদের।

কীর্ত্তনের দলটা হরেন রাখিতে পারিবে।

তারপর দুগ্ধফেননিভশয্যায় শায়িত প্রৌঢ় জমিদারবাবুকে বাহিরে আনা হইল। পুষ্পসৌরভে বাতাস ভারি হইয়া উঠিল। গলায় মোটা মল্লিকার গোড়ের মালা একগাছি আর রক্ত-গোলাপের মালা একগাছি, পরনে শান্তিপুরের মিহি জরিপাড় ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম কয়টাও খোলা হয় নাই, হাত দুইখানি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, আংটিগুলি জলজল করিতেছে, ললাট চন্দনচর্চ্চিত, দিব্য কান্তিমান পুরুষ, যেমন ধবধবে রং তেমনই হৃষ্টপুষ্ট দেহ, নিমীলিত নয়নে ঝালর-দেওয়া বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন যেন। খাটের উপরে নেটের মশারি টাঙানো।

মৃত্যু যে এমন লোভনীয় হইতে পারে, এ কথা ইতিপূর্ব্বে কেহ ভাবিতে পারে নাই।

কীর্ত্তনে কোলাহলে শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। উপরে নক্ষত্রহীন মেঘে-ভরা থমথমে আকাশ, গাঁয়ের চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার; তীব্র গ্যাসের আলো ও বাঁশের খুঁটিতে 'ডে-লাইট' জ্বালিয়া কালবৈশাখীর ঝড়ের মত সেই অন্ধকার বিধ্বস্ত করিয়া শোভাযাত্রা অগ্রসর হইতে লাগিল। সান্ধ্যযাম-ঘোষণারত শিবাদল ছুটিয়া পলাইল,

গ্রামান্তরে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দও ভাল শোনা গেল না। কোন ভগ্ন কুটীর-শয্যায় শায়িত বালক হয়তো সেই কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া মার পাশে কুটীর-দুয়ারে দাঁড়াইয়া এই পরম বিস্ময়কর সমারোহ দেখিতে লাগিল, কোন বালিকা হয়তো দিদিমাকে শুধাইল, কার বিয়ে, দিদা? স্তন্যপানরত কত শিশু কাঁদিয়া মার কোলে মুখ লুকাইল, আলো দেখিয়া পুলকিত কত কন্যা ছাঁদনাতলার কথা স্মরণ করিয়া ভবিষ্যৎ দিনের একটি অমূল্য মুহূর্ত্তের চিত্র মনে মনে আঁকিয়া লইল। কেহ বলিল, আহা! কেহ বলিল, মরতে হয়তো এমনই! দেখে হিংসে হয়!

যাহা হউক, শোভাযাত্রা চলিতে লাগিল। গঞ্জে পৌছিবার পূর্ব্বেই হরেনের দল অনেক বাদানুবাদের পর মোহড়া লইয়াছিল। তাহারা উদ্দণ্ড কীর্ত্তন সুরু করিয়া দিল, পদতলে বসুমতী কম্পিতা হইতে লাগিলেন।

নদীতীরে আসিয়া অবশেষে কীর্ত্তন থামিল। ক্লান্ত ভূপতি খোলটা একপাশে রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

এই শ্মশান! ঢালু বালুতট নদীগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। শুভ্র বালুকার বিছানায় অঙ্গার পরিপূর্ণ চিতার বালিশ। সংসারীর শেষ শয্যা। পিছনে বনঝাউয়ের পটভূমিতে সারি সারি বাবলা গাছ। শ্মশান-বৈরাগ্যে গাছগুলির পাতা ভাল করিয়া গজায় না, ফুলও তেমন ফোটে না। গাছের ডালে দাঁড়কাক অনবরত কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া অমঙ্গলবার্ত্তা প্রচার করিতেছে। অন্ধকার রাত্রিতে বনঝাউয়ের ফাঁকে যে জলজ্বলে লোভার্ত্ত চোখগুলি দেখা যায়, সেগুলির সঙ্গে অস্থি-চর্ব্বণরত অতিকায় কুকুরগুলির বৈরিতা তেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে না। কচি শিশুর মৃতদেহ মাটি চাপা দিয়া পিছন ফিরিতেই শ্মশান-শিবা আসিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই অমলিন নধর কান্তি বাহির করিয়া উল্লাস

প্রকাশ করে, সুভোজ্যের লোভে কুকুরের দলও তখন ছুটিয়া আসে, তারপর টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ি করিয়া দুই দলে ভোজ্য তাহাদের ভাগ করিয়া লয়।

এই শ্মশানভূমি! অমাবস্যার অন্ধকার আর বাদল রাত্রির দুর্যোগে যেখানকার মহিমা সুপ্রকট করিয়া তুলে, যেখানে অসংখ্য প্রেতের অতৃপ্তির নিশ্বাস নিষ্পত্র বাবলাশাখায় আর বনঝাউয়ের শনশনানিতে শব্দমুখর হইয়া একটানা ঝড়ের মত বহিয়া চলে, যেখানে আলগা বালু বাতাসের বেগে ঘূর্ণীর সৃষ্টি করে, নদীজলের কুলুধ্বনিতে কান যেখানে পীড়িত হইয়া উঠে। ঝোপে ঝোপে যখন জোনাকি জ্বলিয়া নিবিয়া যায়, কিংবা শ্মশান-শকুন গভীর রাত্রিতে প্রেতশিশুর মত ককাইতে থাকে, অথবা মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইয়া গোঙানির সৃষ্টি করে, তখন নিবন্ত চিতার পাশে বসিয়া অনতিদূরবর্ত্তী অন্ধকারমাখা নদী ও মাথার উপর পাংশু আকাশের পানে চাহিয়া কোন্ দেশের কথা মনে জাগে? চিতাধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া ঊর্দ্ধস্তরে উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে মনও তাহার সাথী হয়, এবং তারার দেশের ওপারে যে অজ্ঞান জগৎ তাহারই সীমানায় লুব্ধ মধুকরের মত গুঞ্জরণ করিয়া ঘুরিয়া মরে। সেই অমৃতলোকে অমৃতসিন্ধুর তীরে মিলনের সেতু রচনায় তাহার ব্যস্ততা দেখা যায়। পার্থিব ক্ষণিক মিলনকে যুগব্যাপী ধ্বংসহীন আনন্দের মুখে তুলিয়া দিয়াই সে পরম তৃপ্ত। তাই তাহার স্বর্গ রচনার প্রয়াস, পরলোকের বার্ত্তা চয়ন করিয়া প্রিয়বিরহ নিবারণে তাই সে এত উৎসুক। শ্মশান-বৈরাগ্য ক্ষণিকের তরে আত্মবিলোপের যে ভাবটি মনে তীব্রতর ভাবে ফুটাইয়া তুলে, উপরের ঐ নক্ষত্রজগৎ সামান্য স্নিগ্ধতর আলোকে ধীরে ধীরে সে ভাবটি বিলুপ্ত করিয়া মানুষের কানে সুদূর মিলনের আশ্বাসবাণী শুনাইতে থাকে। মানুষ ভস্মীভূত দেহের

পানে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, ও নদীতে ডুব দিয়া আত্মহত্যা করে না, ধীরে ধীরে লোকালয়ে ফিরিয়া চলে।

এতক্ষণে চিতা জ্বলিয়া উঠিল। চন্দনকাঠ ও গাওয়া ঘিয়ের সুগন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ভাঙা কলসি, ছেঁড়া কাঁথা, বালিশ ও বাঁশ দড়ির টুকরার পাশে জমিদার-বাড়ির বহুমূল্য খাট বিছানা বালিশ ফুল ও পরিধেয় স্তূপীকৃত রহিয়াছে। বাবলাগাছে কাক আছে, রাত্রি বলিয়া সে নীরব, বহু লোকের কোলাহলে কুকুরের দল আত্মগোপন করিয়াছে। বনঝাউয়ের গর্তে লোভার্ত্ত চোখগুলি জ্বলিবার ফুরসৎ পায় নাই, যে তীব্র আলো! উপরের আকাশও সময় বুঝিয়া পরিষ্কার নীলের থালায় নক্ষত্রের মণিমাণিক্য সাজাইয়া ধরিয়াছে, এখানকার নদী পর্য্যন্ত স্নানের ঘাটের উর্ম্মিবাহুবিক্ষেপভরা কিশোরী নদীর মতই চপলা। শ্মশানের ভয় ও গাম্ভীর্য্য মেশানো মহিমার যেন অপমৃত্যু ঘটিয়াছে।

হায় রে মৃত্যু! তোমারই রাজত্বে আসিয়া এতগুলি মানুষ আজ তোমাকেই হত্যা করিয়া চলিল!

চারিদিকে গল্পের মিশ্রধ্বনি। যে যে-গল্পের রসিক বহুধা বিভক্ত হইয়া বালুতটে বৃত্তাকারে বসিয়া সেই কাহিনীর চিত্রে বর্ণসম্পাত করিতেছে। চিতায় নিশ্চল তনু অগ্নির বর্ণে বর্ণ মিলাইয়া অঙ্গার হইয়া যাইতেছে, চিতার পাশে পার্থিব ভোগবিলাসের খোলস পরিত্যাগ করিয়া সে অগ্নিস্নাত হইতেছে, সেদিকে কই কেহ তো ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে না? নিশ্চিন্ত মনে মন্দীভূত তেজে ইন্ধন ঠেলিয়া দিয়া ওই লোকগুলি পর্য্যন্ত হাত মুখ নাড়িয়া এত কিসের গল্প করিতেছে?

জীবন—জীবন—চারিদিকে অফুরন্ত জীবনস্রোত। সেই জীবনের কোলাহলে মৃত্যুও বুঝি তুচ্ছ হইয়া গেল।

কলিকাতার পথে দড়ির খাটে চাপিয়া জনস্রোতের মধ্য দিয়া যে শব মুহূর্ত্তের তরে চলিয়া যায়, ক্ষুদ্র এক মুহূর্ত্ত কণায়ও সে তাহার যাত্রাপথের অনুভূতি জাগাইয়া মনকে দোলা দেয় না। ঝড়ে নৌকাডুবি হইলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে পাগল নদ মগ্নস্থানটিকে অতি ক্ষিপ্রতায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়। জীবনের স্রোত যেখানে প্রবল, মরণের তৃণখণ্ড সেখানে মুহূর্ত্তে শতধা বিভক্ত হইয়া এইভাবেই বুঝি মিশিয়া যায়।

আজ যদি জমিদারের পরিবর্ত্তে ভূপতির দিদি এখানে আসিতেন? তাহা হইলে বাঁশের খাটিয়া বহিবার জন্য অতিকষ্টে চারিজন লোককে একত্র করিতে হইত। দীর্ঘ পথ হইত দীর্ঘতর। বনঝোপের অন্ধকার, মাথার উপর রাত্রির প্রচণ্ড ভার ও বৃষ্টির ভয়াবহতা মনকে সর্ব্বক্ষণই বিমুখ করিয়া দিত। নদীর পটভূমিতে ওই ঝাউয়ের বন, বাবলার সারি, ছেঁড়া কাঁথা মাদুর বাঁশ দড়ি ও ভাঙা কলসির মাঝখানে মড়ার হাড় ও মাথার খুলি ডিঙাইয়া ক্ষণপূর্ব্বের নির্ব্বাপিত চিতার পাশে খাটিয়া নামাইয়া চাপা গলায় সকলে একবার 'হরিধ্বনি' দিয়া উঠিত। সেই হরিনাম মনকে আরও ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিত। ওদিকে হাড় চিবাইতে চিবাইতে কুকুরগুলা ক্ষণিকের তরে এধারে চাহিত, ঝোপের মধ্যে খদ্যোতিকার পাশে অনেকগুলা বড় আলোকবিন্দু জ্বলিয়া উঠিত, বাবলা গাছে দাঁড়কাকের ডানা-ঝটপট শোনা যাইত। হা-হা শব্দে বাতাস বালু ছিটাইয়া হাসিয়া উঠিত। নদীতে জলতরঙ্গ বাজিত সেই তালে। কোথাও আলো নাই, একমাত্র যা চিতা জ্বলিতেছে; কোথাও শব্দ নাই, কেবল কাঠ পোড়ার ও চর্ব্বির চটপট শব্দ; চন্দনের পরিবর্ত্তে মাংস-পোড়ার গন্ধ এবং ধূমকুণ্ডলী পাংশু আকাশের কোলে উঠিয়া অন্ধকারকে গাঢ়তর করিতেছে। মৃত্যুপুরীর এই উৎসবময়ী রাত্রির তুলনা আছে কি? এই সুগম্ভীর মৌনতায় ও সুপবিত্র মহিমায় শান্ত মৃত্যুর সত্যকার

সার্থকতা। সর্ব্বদিক দিয়া সুপ্রকট এই বৈরাগ্যকে সমস্ত অন্তর দিয়া গ্রহণ না করিয়া পারা যায় কি ?

ভূপতির মনে হইল, সমস্ত গ্রাম আজ উৎসব করিতে শ্মশানে আসিয়াছে, শ্মশান গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়াছে। সেই শ্মশানে একমাত্র তাহার রুগ্না দিদি শুভা অত্যন্ত অসহায়ার মত পড়িয়া আছেন। এই মুহূর্ত্তে যাত্রা না করিলে দিদির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎও হয়তো হইবে না।

তাড়াতাড়ি নদীতে স্নান সারিয়া অন্যের অলক্ষ্যে ভূপতি ক্ষিপ্রপদে অন্ধকারভরা গ্রামের পথ ধরিল।

মণ্ডল-বাড়ি

দিদিমার সঙ্গে মামার বাড়ি যাইতেছিলাম।

আমাদের গ্রামকে আমরা বলি শহর। পাকা ইটের রাং অন্ধকার রাত্রিতে রাস্তায় মিটমিটে কেরোসিনের আলো জ্বলে, অনেক কোঠাবাড়ি, নিত্য বাজার বসে, বড় স্কুল, পোষ্ট-আপিস—এমন কত কি যাহা দিদিমাদের ওই মাইল দুই দূরের পাড়াগাঁখানিতে নাই। আমাদের শহর হইতে ওই পাড়াগাঁয়ে যাইবার দুইটি পথ। একটি মাঠের ভিতর দিয়া, অন্যটি কতকগুলি ছোট বড় আমবাগানের মধ্য দিয়া বিলের ধারে গিয়া পড়িতে হয়। বিলকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া একেবারে মামারা যে ঘাটে স্নান করিতে আসেন সেইখানে উঠিতে হয়।

দিদিমা এ পথে আসিতে চান না। আমাদের শহরের আমবাগানের শেষপ্রান্তে, বিলের উঁচু পাড়ে কয়টি বড় বড় অশ্বত্থগাছ যেখানটা দিনের আলোককে সর্ব্বক্ষণই ঢাকিয়া আছে, পথ অসমতল, একটু অসাবধান হইলে গাছের শিকড়ে প্রায়ই হোঁচট খাইতে হয়, ওইখানটায় কাহাদের বউ নাকি এক বাদল-সন্ধ্যায় জল আনিবার সময় পড়িয়া গিয়াছিল। পড়িয়া সে আর উঠিতে পারে নাই। তারপর পীরপুরের এক অসতর্ক পথিক—। এমনই অনেক অলৌকিক কাহিনী স্থানটিকে একাকিনী কোন পল্লীনারীর যাত্রাপথকে সুদুর্গম করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার পূর্ব্বে মামার বাড়ি গিয়াছি দিদিমার কোলে চাপিয়া, আজ চলিতেছি হাঁটিয়া। দশ বছরের যে বালক জুতা পায়ে দিয়া ছোট কোঁচা দোলাইয়া, সরু একগাছি ভাঁটের বেত দিয়া দুই ধারের ঝোঁপঝাড় ঠেঙাইতে ঠেঙাইতে আগে আগে চলিয়াছে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে বাধা দিতে বৃদ্ধা দিদিমার সাহসে কুলায় নাই। গ্রীষ্মকালের বেলা, সূর্য্য ডুবিতে বহু বিলম্ব। সুতরাং নিঃশঙ্কেই চলিয়াছি।

ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেই অশ্বত্থগাছের সারি, সেই বন্ধুর পথ, শিকড়-উঠা রাস্তা। যে কাহিনী মামার বাড়ির প্রত্যেকের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, দূরে থাকিয়া যে কাহিনীকে উপকথার মতই মনোরম লাগিয়াছে, আজ হঠাৎ তাহার সান্নিধ্যে আসিয়া, কি জানি কেন, মনে হইল, ওই ঘন পত্রের ছায়ায় সুপ্ত অন্ধকারে, চারিদিকে বনঝোপের ঈষৎ আন্দোলনে, বাতাসের রহস্যময় শনশনানিতে সে কাহিনী আর শুধুই কৌতূহলের বস্তু হইয়া নাই।

চলার গতি থামাইয়া দিদিমাকে ডাকিব ভাবিতেছি, এমন সময় পাশের ঝোপ নড়িয়া উঠিতেই দেখি, এক কালো মূর্ত্তি। চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই দিদিমা পিছন হইতে হাঁকিলেন, কে রে, গিরে নাকি?

মূর্ত্তি বাহির হইয়া হাসিয়া বলিল, হাঁ মা-ঠাকরোণ। এনারে বুঝি লিয়ে এসতেছ? উঃ, বাবুর যা ভয়! শউরে বটে। দিনকতক রাখ ইখানে, ডর যাক।

তুই এখানে কি করছিলি?

কাঠের লেগে আইলাম। একটু রও মা-ঠাকরোণ, তোমাদের আগুয়ে দিই।

না রে না, তুই কাঠ গুছিয়ে নিয়ে আয়। এত বেলা রয়েছে, এই তো এসে পড়লাম!

ঘাটের ধারে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিলাম।

প্রকাণ্ড বহুদূরবিস্তৃত মাঠ, একেবারে নীল আকাশের কোলে মাথা রাখিয়াছে। কোথাও বনরেখা নাই, অস্পষ্টতা নাই। মাঠের বুকে শ্যামল শস্যের তরঙ্গায়িত রূপ, মনে হয় সে রূপ শস্যের নয়, মাঠের। সাদা রুক্ষ মাঠ হইলে দৃষ্টির লক্ষ্য অত দূরপ্রান্তে পৌঁছিত না। মাঠকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া কালো জল ভরা বিল। অল্পই চওড়া, গভীরতা আছে। কেমন ছোট ছোট পানকৌড়ি অনবরত ডুব দিতেছে, আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিলাম,—

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠসে—
তোমার শাশুড়ী ব'লে গেছে বেগুন কোটসে।

কত লাল সাদা পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, পদ্মের পাতাগুলি জলের উপর কেমন চকচক করিতেছে, ইচ্ছা করে উহার একখানি তুলিয়া আনিয়া ভাত খাইতে বসি। এদিকে হাঁটু-জলে দাঁড়াইয়া 'হিসহিস' শব্দে ধোপারা পাটের উপর কাপড় আছড়াইতেছে। ধোপানীরা ঢালু তীরের উপর কাপড় শুকাইতে দিয়া উনানে কি সিদ্ধ করিতেছে। কতকগুলা কালো কালো লোক কঞ্চির ছিপ জলে ফেলিয়া মাছ ধরিতেছে। পাশে তাহাদের ছোট খালুয়ে কত রকমের ছোট ছোট মাছ। পা আর চলে না।

দিদিমা অনবরত হাত ধরিয়া টানিতেছেন।

বেলা যে গেল, চ! এখনও পোয়াটাক পথ।

টানিতে টানিতে তিনি বুনো পাড়ার মধ্যে আনিয়া তুলিলেন।

এই গাঁ—নাম নবিপুর। ধূলাভরা পথ, এক পাল দিগম্বর ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। পথের দুই ধারে বনঝোপ, কতকগুলা কুকুর শুইয়া আছে। বুনোদের নোংরা খড়-উঠা চালা, ভাঙা দাওয়া, তেমনই

ময়লা 'টেনা' পরিয়া গোল হইয়া বসিয়া জটলা করিতেছে, তাস পিটিতেছে আর তামাক টানিতেছে। দিদিমাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল, কি গো ঠাকরোণ, লাতি বটেক ?

আরও খানিকটা আগাইয়া পাইলাম কুমোরপাড়া। সারি সারি হাঁড়ি সাজানো। পোয়ানে আগুন জ্বালিবার উদ্যোগ চলিতেছে, যত রাজ্যের কাঠের পালা আনিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহার পরেই ওই বড় তেঁতুলগাছটা। ওইখান হইতে একদৌড়ে মামার বাড়ি যাওয়া যায়। মনে আছে, পূর্ব্বে এই তেঁতুলগাছতলায় আসিয়াই দিদিমার কোল হইতে নামিয়া পড়িতাম। নামিয়াই দে ছুট। কলুবাড়ির মোড় হইতে মামার বাড়ির দোর পর্য্যন্ত রাস্তাটিতে দিব্য একহাঁটু ধূলা। ধূলার মধ্যে পা ঘষিতে ঘষিতে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিতাম, 'কু'। তারপর দৌড় আর ঘসঘস শব্দ। এমন ধূলা উড়িত যে বুড়া দাদামহাশয় দাওয়া হইতে নামিয়া আসিয়া স্নেহভরে আমার কান দুইটিতে অল্প একটু দোলা দিয়া বলিতেন, ওগো, শহর থেকে তোমাদের ধূলোভরা মালগাড়ি এল। এখন নাইয়ে ধুইয়ে শালাকে মানুষ ক'রে নাও।

বলিতাম, ইঃ, আপনি তো পাড়াগেঁয়ে।

পাড়াগেঁয়ে! আচ্ছা শালা, বল দেখি তোদের শহরে এমন ধুলো আছে ?

হুঁ, অনেক।

তোদের শহরে শেয়াল ডাকে ?

কত।

তোদের বাড়ির পাশে হালুম ক'রে বাঘ বেরোয়।

বেরোয়ই তো।

এই এত বড় বড় গাছ আছে ?

আছেই তো।

দূর শালা—শহুরে ভূত !

বুড়া হাসিতে হাসিতে ধূলাসুদ্ধই আমায় কোলে তুলিয়া লইতেন। লইয়াই চুমা—একটি নহে, অনেকগুলি।

এখনও তেঁতুলগাছ তেমনই ঝোপভরা, কলুপাড়ার মোড়ে তেমনই প্রচুর ধূলা। আমি তত শিশু নহি, শহর কি অল্প অল্প বুঝি। ধূলায় ছুটিবার লোভ আছে, ফরসা কাপড় ময়লা হইবার ভয়ও আছে। পথের শেষে কান ধরিয়া যিনি কোলে তুলিয়া লইতেন, তিনি কেবল নাই। থাকিলে বলিতাম, শহরে ধূলা নাই, শেয়াল নাই, বাঘ নাই, বনজঙ্গল নাই। ওসব নাই বলিয়াই তো শহর—শহর। কিন্তু আশ্চর্য্য কেহ আর শহুরে বলিয়া ঠাট্টাও করে না !

আমাদের অনেক শিষ্যসেবক আছে। তাহাদের অধিকাংশই চাষী। গরিব, চাষ-আবাদ করিয়া বৎসরের অন্নসংস্থান করিয়া থাকে। জমিদারের প্রাপ্য মিটাইয়াও হয়তো বৎসরের শেষে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, কিন্তু রোগের আতিশয্যে সেটুকুর ভরসা তাহাদের নাই। চৈত্রে যেমন খাজনার তাগাদায় সতর্ক নায়েব প্রজামহলে শাসনের বিভীষিকা জাগাইয়া তুলেন, ভাদ্রের রৌদ্রে পাতা পচিয়া ম্যালেরিয়া তেমনই নিয়মিতভাবে হানা দেয়। চাষীর ঘর, হিসাব বলিয়া বালাই নাই। যদি বা এসব বাঁচাইয়াও কিছু জমিল তো কিসে খরচ করিবে যেন উহারা ভাবিয়াই পায় না। ঘটা করিয়া সত্যনারায়ণের সিন্নি দেয়, বউদের রাঙাপাড় কাপড় আসে, নবান্নের আয়োজন, পৌষপার্ব্বণের ধুম,

গাছ-প্রতিষ্ঠা এবং গুরুদের প্রণামীতে খরচ করিয়া তবে উহারা নিশ্চিন্ত হয়।

পরের দিন দুপুরবেলা দিদিমা তাড়াতাড়ি খাইয়া উঠিয়াই একখানি ফরসা কাপড় পরিলেন। গায়ে একখানা নামাবলী জড়াইয়া মামীমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, বউ, আশু রইল, একটু নজর রেখ। কাল আমি ফিরে এসে ওকে দিয়ে আসব।

মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি গোঁসাই-চরে চললেন? মণ্ডল-বাড়ি বুঝি?

দিদিমা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তাদের ছেলের ভাত, পরশু হাটে লোক এসে খবর দিলে। ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল। তা হ'লে যাই!

আমি দিদিমার আঁচল ধরিয়া কহিলাম, যাব।

যাবি? কোথায় রে? এই দেখ ছেলের অন্যায় কথা! সে যে অজ পাড়াগাঁ—

হ্যাঁ, পাড়াগাঁ? আর এ বুঝি শহর?

হাঁটতে হাঁটতে মাজা খ'সে যাবে। বালির রাস্তা, বন—

তা হোক, আমি যাব।—বলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইলাম।

দিদিমা বিষণ্ণ মুখে মামীমার পানে চাহিয়া বলিলেন, বউ!

মামীমা বলিলেন, আদর দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন, শুনল তো কথা! যে বাঘ পথের ধারে, গিয়ে দেখুক না মজা!

বাঘের দোহাই কার্য্যকরী না হওয়াতে অগত্যা দিদিমা রাজি হইলেন।

পাড়াগাঁর পথ চলিতে দুই ধারে অনেক কিছু নজরে পড়ে। সেসব দিকে না চাহিয়া চলিবার আনন্দেই দৌড়াইতে লাগিলাম।

দিদিমা যথাশক্তি পা চালাইয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, ওরে, থাম থাম, বাঁ দিকে, বাঁ দিকে। আবার আমতলায় দাঁড়ায়! দেখ দেখ, প'ড়ো আম মুখে দিলে! ওরে, ও আশু—

আশু তখন আমের মিষ্টত্বে পূর্ণতোষ, কে শোনে নিষেধবাণী! সময় থাকিলে কি ফলসাগাছের পাকা ফলের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম? মাঠের জামগাছগুলি কত নীচু! কি থ'লো থ'লো পাকা জাম উহার প্রত্যেকটি শাখায়! কিন্তু এসবের লোভ করিতে গেলে আজ আর মণ্ডল-বাড়ি পৌঁছানো যাইবে না। ফিরিবার মুখে দেখা যাইবে।

ঘণ্টাখানেক চলিয়া গঙ্গার তীরে খেয়াঘাটে পৌঁছিলাম। দিব্য বালু-বিছানো তীর, কেমন ঢালু হইয়া গঙ্গার ভিতর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। শেয়াকুল-কাঁটা দিয়া ঘেরা দুই ধারের জমি, মেলাই পটলের ফুল ফুটিয়াছে, ছোট ছোট পটল ধরিয়াছে, কি চমৎকার! হাতের নাগালে থাকিলে গোটাকতক পটল তুলিয়া দিদিমাকে দেখাইয়া বলিতাম, দেখ, কেমন সত্যিকারের পটল!

মাঝি নৌকা আনিলে আমরা নৌকায় উঠিলাম। একটা লোক ছাগল লইয়া উঠিতে সে কি নাকাল! জল দেখিয়া ছাগলটার যা প্যা-প্যা ডাক! অন্য লোকগুলি বিরক্ত হইয়া বলে, আঃ, কানের পোকা বার করলে যে!

লোকটা অপ্রতিভভাবে ভাঙা কাঁঠালের ডালটা ছাগলের মুখে ধরিয়া বলে, কি করি মশায়, গিয়েলাম পানপাড়ার হাটে, ন সিকেয় যায়, এত বড় খাসী। গোপাল ময়রার কাছ থিকে ধার চেয়ে কেনলাম।

তা গাঁতে নিয়েছ, জোলার পো। কোরবানিতে জুৎ দেবে।
—লোকটা হাসিতে হাসিতে গল্প জুড়িয়া দিল।

হঠাৎ মাঝি চেঁচাইয়া উঠিল, এই খোঁকাবাবু, পানিমে হাঁত দিয়ো না, কুম্ভীর আছে।

দিদিমা ফিসফিস করিয়া বলিলেন, সবতাতে দুষ্টুমি, হাত ওঠা।

আমি হাতখানি অল্প তুলিয়া চুপি চুপি বলিলাম, কই কুমীর? আবার স্রোতের বিপরীত দিকে হাত নামাইলাম। গঙ্গার ঠাণ্ডা জল, কেমন হাতের উপর দিয়া স্রোত কাটিয়া চলে! বেশ একটা কল-কল শব্দ হয়। খানিকক্ষণ রাখিলে হাত ব্যথা হইয়া উঠে। কালো জল হাতের ঠেলায় সাদা কাচের মত জ্বলিয়া উঠে, এক আঁজলা খাইয়া দেখি, বেশ মিষ্ট। কিন্তু জল তুলিতে গেলে অঞ্জলিতে অল্পই উঠে। পা দুইখানি ডুবাইতে পারিলে—। কিন্তু ওদিকে দাঁড় ধরিয়া মাঝি চাহিয়া আছে, এদিকে দিদিমা আমার একখানি হাত ধরিয়া ঠায় বসিয়া আছেন। যেন কয়েদীকে নৌকায় চাপানো হইয়াছে।

ওপারের মত এপার সমতল নয়। আমাদের শহরের দোতলা-সমান উঁচু পাড়, নীচে দাঁড়াইয়া উপরে চাওয়া যায় না। পাড়ের ওপাশেই একটা মস্ত আমগাছ শিকড় বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

দিদিমা সেই দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিলেন, ওই মণ্ডলদের বাগান। চ, ওপরে আর উঠব না, একেবারে ওদের ঘাট দিয়েই যাই।

ধারে ধারে মিনিট-দুই হাঁটিয়াই ঘাট পাওয়া গেল। তালগুঁড়ি দিয়া সিঁড়ি করা। ঘাটের কিনারে বসিয়া একটি কালো বউ বাসন মাজিতেছিল। আমাদের দেখিয়া ডান হাতের মাঝখান দিয়া মাথার ঘোমটা একটু বাড়াইয়া দিল।

দিদিমা তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে, কেদারের বউ ?

বউটি মাথা হেলাইয়া বলিল, হাঁ, মা-ঠাকরোণ। খোকাটি কে ?

নাতি।

ওঃ, চন্দুদের বাড়ি ভাতে এলে বুঝি ? বাঃ, দিব্যি খোকা! একটু দেঁড়িয়ে যাও, মা-ঠাকরোণ, জলে হাতটা ধুয়ে একটা পেন্নাম করি।

থাক থাক, জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক। হুঁ, কালও আছি। যাব, যাব বইকি। কেদার ভাল তো ?—বলিতে বলিতে আমাকে লইয়া দিদিমা উপরে উঠিলেন। সেখান হইতে মণ্ডল-বাড়ি কতটুকুই বা! এই বাগান-সংলগ্ন বাড়ি, ছেঁচার বেড়া দিয়া ঘেরা সারি সারি কয়েকখানা চালা। চালার ওধারে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। বয়স্থা গৃহিণীর শাসনের স্বর, কাঠ চেলাইবার শব্দ, ছেলেদের কলরবের সঙ্গে মিশিয়া বাড়িখানিকে বেশ সজীব করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য, দিদিমাদের গাঁয়ের চেয়েও এই অজ-পাড়াগাঁয়ে বন কোথায়, ধুলাই বা কই! এধারে ওধারে যে ধারেই চাও, খালি মাঠ। কোথাও কুমড়ালতায় ভরা, কোথাও ফুটি তরমুজ রাশীকৃত বিছানো, কোথাও সবুজ চারা ধানগাছের গালিচা পাতা, কোথাও বা কলাবাগান। বেড়ার ধারে কেমন ঝিঙের হলদে ফুল ফুটিয়াছে, লাল নটে-শাকের জমিখানি ঠাস বুনানিতে ভরা। না, চমৎকার গ্রাম এই গোঁসাই-চর!

বাড়ির মধ্যে যে ঘরখানির দাওয়ায় আমরা বসিলাম তাহা সবচেয়ে উঁচু এবং পূব-দুয়ারী। বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলি হইতে পৃথক; দিব্য

নিকানো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রতিমা-দর্শনকালে চারিদিকে যেমন ভিড় জমিয়া উঠে, আমাদের ঘিরিয়া তেমনই একদল ছেলে মেয়ে বউ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। কৃশকায়া কালো বয়স্থা একটি বউ পিতলের কানা-উঁচু একখানা থালা আনিয়াছে, গঙ্গাজল ভরা মাজা চকচকে ঘটি আনিয়াছে, নূতন শুকনা গামছাও একখানি তাহার কাঁধে রহিয়াছে। আমাদের পায়ের কাছে বসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, দেখাদেখি সেই সমবেত জনতা আমাদের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িল।

যেটুকু ধূলা পায়ে জমিয়াছিল, অতগুলি লোকের করস্পর্শে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। তারপর দিদিমার একখানি পা টানিয়া বউটি সেই কানা-উঁচু পিতলের থালার উপর রাখিল, এবং ঘটির জল দিয়া পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ধোয়ানো শেষ হইলে নূতন গামছা দিয়া পা মুছিয়া নিজের আঁচলে সযত্নে মুছাইয়া দিল। তারপর আমার পালা। আমি নিজে পা ধুইব বলাতে বউটি বলিল, ওমা, সে কি কথা! আমাদের ছিচরণের চন্নামেত্ত দেবা না, বাবা? তা কি হয়? নক্ষী গোপাল, একটু থির হয়ে ব'স।

আপত্তি বৃথা।

উভয়ের ধৌত পাদোদকে থালা ভরিয়া উঠিল। অতঃপর ছেলে বুড়া মিলিয়া সেই ময়লা জল পরম পরিতৃপ্তিতে মাথায় ঠেকাইয়া খাইয়া ফেলিল, যেমন করিয়া আমরা দেব-দেবীর চরণামৃত পান করি। কে জানে, ইহারা আমাদের দেবতা মনে করিয়াছে বুঝি!

প্রথম পর্ব্ব মিটিলে বউটি কড়জোড়ে বলিল, কি সেবা হবে, মা? ঘরে ঘি-ময়দা মজুদ, তরকারির মধ্যে পটল আছে, ভাল মিষ্টি তো নেই।

দিদিমা বলিলেন, মিষ্টি কি হবে না, ঘরের গুড় আছে তো?

বউটি ঘাড় নাড়িল, হুঁ, থাঁড় গুড় আছে।

ওতেই হবে।

আর মা, তোমাব আণ্ডী বিইয়েছে, আমি গাঙে একটা ডুব দিয়ে এসে গাই দুইব। হেই মা, একবারটি উঠে দেখ না, বিছানা-টিছানা সব ঠিক আছেন কিনা। সেই পোষ মাসে এয়েলে কেচেকুচে তুলে আকলাম। হেঁ মা, খোকার নাম কি?

আশু।

রাশু? তা বেশ, বড়মেয়ের ছেলে বুঝি? দিব্যি খোকা, আজ-পুত্তুর!

দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁলা বউ, তোর দেওরের বিয়ে দিবি কবে?

আর মা!—বলিয়া বউ ফিসফিস করিয়া বলিল, সোমত্ত বয়েস, বাড়ি আসে না আত্তিরে। এত চেষ্টা-চরিত্তির, তা মরদ একবার ইধারে মাথা চালে, একবার উধাবে। স্বর আরও একটু নামাইয়া বলিল, জানই তো সৈরভী জেলেনীকে, শুনিছি গাছচালা জানে, মানুষ বশ করবে তার আর আশ্চর্য্য কি!—বলিয়া বউ গালে হাত দিল।

দিদিমা বলিলেন, আচ্ছা, আজ আসুক, আমি বলব।

ব'ল মা, ব'ল, তোমাদের আশীব্বেদে যদি মতিগতি ফেরে। মোদের, মা, হাঁক্কাই মেরে ওঠে। তোমার বড়ছেলের দুষকুই তো ওই। বলে, বউ, নাঙল ধরব কোন্ হাতে? গুয়োটা যদি কথাটা শোনে তো মোদের মোয়াড়া নেয় কে? নেখন!—বলিয়া কপালে হাত দিয়া একটি নিশ্বাস ছাড়িল।

আর দুইটি বউ, মেজ এবং সেজ, পাশে বসিয়াছিল। রং কালো

হইলেও বড়বউয়ের মত রোগা নহে, বেশ মোটাসোটা। হাতে রূপার পৈঁছা, রূপার খাড়ু, কপালে উল্কি। দিদিমা মেজটির পানে চাহিয়া বলিলেন, পৈঁছে নতুন হ'ল বুঝি ?

মেজবউ আহ্লাদে একমুখ হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, হেঁ মা, আর দিদির গোট।

বড়বউ হাসিয়া উঠিল, মুখে আগুন মোর, বলতে ভুলে গিছি মা। এই গোট মা, গেলবার কোষ্টা বেচে কিছু হয়েলো; তোমার ছেলে বললে, কে কি নেবা বল? আমি বললাম, বয়েস ভারি হয়েছে গোট দ্যাও, মেজোরে দ্যাও পৈঁছে। সেজ সাধ ক'রে নিলে খাড়ু।

তা বেশ হয়েছে। গতর সুখে থাক, ভোগদখল কর। তা কর্ত্তাদের কি হ'ল ?

কার আর কি হবে মা! নকত্তা কিনেলো ছাইকেল। ও তো মারমুখো, সেও তেরিয়া। মাথা-ফাটাফাটি হয় ব'লে বললাম, হয় ধার হোক, ছেয়ের ছাইকেল ওরে দ্যাও। উই দ্যাখ মা, ঠ্যাং ভেঙে চালের বাতায় ঝোলছেন উনি।

ও মা গো, এক গাদা টাকা নষ্ট করলি? তোরা চাষ করবি, তোদের এসব মতিগতি কেন?

নল্লাটের নেখন!—বলিয়া বড়বউ খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

দিদিমা কি কথা বলিবার আগে মেজবউ বলিল, এস মা, ঘর দেখবা।

দিদিমার সঙ্গে আমিও উঠিলাম।

পূবে অল্প একটু মোড় ফিরিতেই দক্ষিণমুখো প্রকাণ্ড এক দাওয়া।

দাওয়ায় এক সারিতে চারিখানি ঘর। ঘরগুলিতে দেখিবার এমন বিশেষ কিছু নাই। ঢুকিবার দুয়ার বিচিত্র আলিপনায় ভরা। সাদা পিটুলি-গোলার ধারায়, হলুদের আর লাল সিঁদুরের ছাপে চৌকাঠ বিচিত্রিত। ঘরের মাটির দেওয়ালেও হলুদ আর সাদা পিটুলির আঁক। কড়ির আলনা, কুলুঙ্গিতে মাটির পুতুল, পেতে, ধামা, কুলা, ধান ও আনাজপাতিতে ঘর ভর্ত্তি। একখানা করিয়া তক্তাপোষ পাতা। আর যে কি আছে ভাল করিয়া নজরে পড়ে না। ঘরের ওই একটিমাত্র দুয়ার, জানালা নাই, কিন্তু গ্রীষ্মকাল হইলেও ঘরের মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা। কোন ঘরে নক্সা-করা কাঠের সিন্দুক আছে, কোন ঘরে জলচৌকির উপর ঝকঝকে সাদা কাঁসার বাসন সাজানো। কাঁথা-বালিশগুলি পরিষ্কার। মাটির হইলেও ঘরের মধ্যে বা দাওয়ায় কোথাও ধূলা জমিয়া নাই, বা কোথাও ভাঙাচোরা নহে। পশ্চিমের দাওয়া একটু দূরে, সেখানিতে রান্না চলে। উত্তরে গোয়ালঘর। বাড়ির প্রকাণ্ড উঠান, কোথাও জঞ্জাল জমিয়া নাই, একটা দূর্ব্বাও অঙ্কুরিত হইতে পায় না। কেবল আমাদের পূব-দুয়ারী ঘরের দাওয়ার পাশে মাটির মঞ্চে স্বাস্থ্যবান এক তুলসীগাছ—প্রভাতের জলসিঞ্চনে পরিপুষ্ট ও সন্ধ্যার দীপালোকে দীপ্তিময়।

ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দিবার স্পৃহা এ বাড়ির কোথাও নাই। অথচ নিঃশব্দে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহাকে ঐশ্বর্য্য ছাড়া কি-ই বা বলিতে পার? প্রকাণ্ড উঠানে বড় মরাইটি ঘিরিয়া যে চারিটি ছোট মরাই রহিয়াছে উহার কোনটিতে মুগ, কোনটিতে কলাই বা মুসুর। ঘরের দাওয়ায় স্তূপীকৃত আলু, পেঁয়াজ, সরিষা, ফুটি, কাঁকুড় ইত্যাদি নিত্য-ব্যবহার্য্য গৃহস্থালীর কোন্ দ্রব্যটিরই বা অভাব? বলদ ছাড়া আট-দশটি গাভী, ছোট গোয়ালে কতকগুলি ছাগলও ডাকিতেছে।

এইমাত্র পুকুর হইতে জোড়া-দশেক হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক শব্দ করিতে করিতে উঠানের উপর দিয়া গোয়ালের পাশে দর্ম্মা-ঘেরা কুঠুরিতে গিয়া ঢুকিল।

রান্নাঘরের পাশে ঢেঁকিঘর। দমাদম শব্দে ঢেঁকি পড়িতেছে। কাল ছেলের ভাত, আনন্দ-নাড়ুর চাল কোটা হইতেছে। এতক্ষণ দিদিমা আসেন নাই বলিয়া এই সমস্ত কাজে পূর্ণোদ্যমে উহারা লাগিতে পারে নাই। একছুটে বাহিরটাও দেখিলাম।

প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, সামনে হাল, লাঙল এবং খানদুই গরুর গাড়ি পড়িয়া আছে। দাওয়ায় বসিয়া মুনিষজন তামাক টানিতেছে, আর সামান্য কথায় হাসির ঢেউ তুলিতেছে। বাড়ির লাগাও পুকুর। আমাদের দেশে ডোবা বলি, উহারা বলে পুকুর। জ্যৈষ্ঠের দিন বলিয়া হাঁটুভোর জল উহাতে আছে। তবু শোনা গেল, এ অঞ্চলে উহাই নাকি বড় পুকুর। অনেকগুলি ফাল্গুনেই ফুটিফাটা হইয়া যায়, চৈত্রে জলবিন্দুও খুঁজিয়া মিলে না। পুকুরপাড়ে কয়েকটা নারিকেল ও তাল গাছ। নারিকেলগাছগুলিতে তেমন তেজ নাই। নোনা জমি না হইলে ফলন নাকি তেমন হয় না।

চাষাদের ছেলেগুলি যেমন কালো তেমনই রোগা, কিন্তু কথা-বার্ত্তাতে অকপট। বেশ একটু গ্রাম্য টান আছে। অল্প সময়ের মধ্যে এমন অনেক গাছ চিনাইয়া দিল যাহার অভিজ্ঞতা লইয়া শহরের আত্মম্ভরী ছেলেগুলিকে অনায়াসে ঠকাইয়া দিতে পারি।

খেজুরগাছ দেখাইয়া বলিল, শীতকালে আসিলে পেটভোর রস খাওয়াইয়া দিতে পারিত, এখন মাঠে কি-ই বা আছে! তখন ক্ষেতে ক্ষেতে মটরশুঁটি, ছোলার শুঁটি, আক প্রচুর পাওয়া যায়। মাটি খুঁড়িলে এত বড় বড় শাঁকালু বাহির হয়। মূলা তুলিয়া খাইতেও

কম মজা নহে। ছোট ঝাঁকড়া গাছগুলিতে কেমন সুন্দর কুল পাকিয়া থাকে! এখন খালি ফুটি আর তরমুজ।

মাঠের মাঝে বসিয়া তরমুজ ভাঙিয়া খাইলাম। কি মিষ্ট, কেমন ঠাণ্ডা জল! কতক খাইলাম, কতক ফেলিলাম। এমন করিয়া প্রকৃতি-মার কোল হইতে জিনিস উঠাইয়া লইয়া খাইতে যা তৃপ্তি! কাপড়ে ধূলা লাগিয়াছে, তরমুজের জল মুখ বাহিয়া জামা ভিজাইয়া দিয়াছে, চলিতে চলিতে পা ব্যথা হইতেছে, সন্ধ্যা অত্যাসন্ন, তবু এই অজানা সীমাহীন মাঠে অজানা সঙ্গীর সঙ্গে কলরব করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে এতটুকু আশঙ্কা, ক্লান্তি বা বিরক্তি বোধ করিতেছি না। ইচ্ছা হইতেছে, এমনই করিয়া সারা রাত্রি সারা মাঠখানিতে ঘুরিয়া বেড়াই, এমনই করিয়া অনর্গল বকিয়া যাই, ভূমি হইতে খাদ্যকণা খুঁটিয়া খাই, আর না ঘুমাইয়া ওই তারাভরা আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকি।

ফিরিয়া দেখি, আমার খোঁজে চারিদিকে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। লণ্ঠন জ্বালিয়া কর্তারা বাহির হইতেছেন, সোরগোলে কান পাতা দায়। দিদিমা কেবল 'হায় হায়' করিতেছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। আলো ফেলিয়া কর্তারা ছেলেগুলিকে ধরিয়া প্রহার দিল, আর কি সে অকথ্য গালাগালি! বড়কর্তা আমাকে দু হাতে মাথার উপর তুলিয়া একেবারে বাড়ির মধ্যে দিদিমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, কেমন গা মা-ঠাকরোণ, ইনিই তো? এনার জন্যে ছেলেগুলোকে আজ খুন করলাম না, নইলে চাষার আগ জানই তো!

দিদিমা আমায় খুব খানিকটা বকিলেন; কি করিব, চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে সে বকুনি হজম করিলাম। বাহিরে রোরুদ্যমান বালকগুলির বেদনায় বুকটা কেমন মোচড় দিয়া উঠিল। আহা, আমারই জন্য তো বেচারীরা মার খাইল !

বড়কর্ত্তা দাওয়ার উপর বসিল। জোয়ান চেহারা, কিন্তু বড় কর্কশ। কালো দৈত্যের মত ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা, মস্ত গোঁফ, চওড়া হাত, কথাগুলি পর্য্যন্ত মিষ্ট নহে। দিদিমা দিব্য হাসিয়া কথা কহিতেছেন, আমি মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চাহিলাম।

বোঝলে মা, এবার ভুঁই কিছু বেরিয়ে নেলাম। ষোল বিঘেয় আলুর চাষ দেব ভাবছি। নীলে অয়েছে, অত্না অয়েছে—বলে, ভাবনা কি, বোঝলে মা? ভাদ্দরের পাটে কিছু প্যালাম, তোমার বউরো বললেন, পৈচে চাই, গোট চাই, খাড়ু চাই। বললাম, নে বিটি, তোদের গব্বেই যাক। খড়কুটো বেচে কিছু জমেলো, নকর্ত্তা ছাইকেল কিনলে। কলুইয়ে এবার যা নাভ হয়েছেন, খোকার ভাতে ঘটা তো হোক! তারপর আ'স আমন ধান আছে, গুড় আছে, পাট আছে, মনে করছি, একটা মন্দির পিতিষ্টে করব, বোঝলে মা? গাঙের অবস্থা দেখলে তো? উনি আমাদের বাগানের আধখানা নিয়েছে, আসছে বার্ষেয় বাকিটুকু থাকবেন না। তাই ভাবছি, কোশটাক দূরে ওই হিজুলীতে গিয়ে এবার চালা বাঁধব। বাপ-পিতেমোর ভিটে, বোঝলে মা, তা দেবতার মন্নি, মনিষ্যিতে কি করতে পারে? তেনারা দিয়েছে, তেনারাই নিক।—বলিয়া মণ্ডল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

দিদিমা বলিলেন, ভাল ক'রে পূজো-আচ্ছা দে, দেবতা মুখ তুলে চাইবেন বইকি।

দুত্তোরি দেবতা! ও সুমুন্দিরা কারও ভাল দেখতে পারে?

গেল বার দেই নি জোড়া-পাঁঠা? অক্কে মাটি ভিজে জবজবে। জষ্টিতে পূজো খেলেন আর আষাঢ়ে বাগানে ঢোকলেন। ছুত্তোরি দেবতা!

এবারেও ভাল ক'রে পূজো দে, বাবা।

দেবই তো। ওই গোয়ালে চারটে পুরুষ্টু কালো পাঁঠা, দেখি—। বেইমানি কাণ্ড! পূজো খেয়েও যদি বাগান পানে ঝোঁক ধরেন তো নাতি মেরে এই ছাউনি উপড়ে ওই হিজুলীতে গিয়ে ওঠব। দেখব ওনার জারিজুরি কত!

তা হ্যাঁরে, আগে নবার বিয়েটা তো এ ভিটে থেকে দিয়ে যা।

মণ্ডলের গলার স্বর আগ্রহে উত্তেজিত হইল, তোমারে বললে নাকি কিছু? করবে বিয়ে?

করবে না? বয়েস তো হয়েছে।

বয়েস-কাল ব'লেই তো ওনার ছরাদ্দর জোগাড় ক'রে একেছি। গুয়োটা শোনে কই?

ছিঃ! ভাইকে ওকথা বলতে আছে?

সাধে বলি, আগে পিত্তি জ্ব'লে যায়। বলব কি মা-ঠাকরোণ, নিতাইয়ের অমন মেয়ে, ন গণ্ডা পণে দিতে চায়; সুমুন্দি বলে, না।

মেয়েটির বয়েস কত?

এজ্ঞে, একটু বেশিই; এই ন পেরিয়ে দশে পড়েছেন। তাই কি ওই বিটিদের মত গায়ের অং, যেন বেলেডাঙার দুগগো-পিতিমে!

ওই মেয়েই ঠিক কর, আমি মত করাব। এইমাত্র এসে আমায় প্রণাম ক'রে গেল। বিয়ের কথা বলাতে বললে, দাদারে ব'ল আমি রাজি।

অ্যাঁ, আজি? হাঁরামজাদী মাগী, দেখ, কতা নেই, দুমদাম

ঢেঁকিতে পার দিচ্ছেন! ওরে মাগী, ইদিকে আয়, আজ তোরই এক দিন, কি আমারই এক দিন! তুই আমায় জানাস নি!

ঢেঁকিশাল হইতে উত্তর হইল, মর ভাগাড়, মর, মা-ঠাকরোণ অয়েছেন না? তোর কি একটু নজ্জা নেই, হায়াখেকো? ওনার সামনে কি গাঁ মাথায় ক'রে বলব, ওগো, তোমার ভাই পিণ্ডি গিলবে গো, গিলবে।

মণ্ডল আর কিছু না বলিয়া দিদিমার পায়ের উপর শুইয়া পড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ, বাঁচালে মা-ঠাকরোণ।

তা, চন্নু, ছেলের কি নাম রাখলি?

পুৎঠাউর বললেন, আমনিবাস।

রামনিবাস! তা বাপু, যা তোদের মুখে বেরোয় এমন নাম রাখলেই তো হ'ত।

কিন্তু মা-ঠাকরোণ, উনি যে হয়েছেন আমের মত। এমনই কোঁদা-কাঁদা নবদুব্যোদলশ্যাম।

দিদিমা হাসিতে লাগিলেন।

দিদিমা সারা রাত্রি জাগিয়া আনন্দ-নাড়ু ভাজিলেন। মোড়লরা কয় ভাই দাওয়ায় বসিয়া কত কি বকিতে লাগিল। বউয়েরা এঘর ওঘর ছুটাছুটি করিয়া ফায়ফরমাস খাটিতে লাগিল। ছেলেরা নাড়ু খাইয়া খানিক হুটাপুাটি করিল, তারপর দাওয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতে লাগিল। গরম লুচি, পটল-ভাজা, এক বাটি দুধ ও মিষ্ট খাইয়া আমিও আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরখানিতে শুইলাম। অজানা জায়গা, একলা বহুক্ষণ ঘুম আসিল না। ভাবিতে লাগিলাম, বেশ জায়গা, স্কুল নাই, পড়ার তাড়া নাই, সময়ানুবর্ত্তিতায় ছুটাছুটি করিতে হয় না। সকালে উঠিয়াই ছেলেরা ছোটে মাঠে—সারা দিন খেলিয়া বেড়ায়, ক্ষুধা

পাইলে ক্ষেতের ফল তুলিয়া খায়, পুকুরের জলে ঝাঁপ খায়, দুপুরে ভাত খাইতে বসে, না ঘুমাইয়া আবার ছোটে মাঠে, কত দূর, যেখানে নীল আকাশ জমির কোলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কেহ বারণ করিতে নাই, বকিতে নাই। খালি সাদা মাঠ আর খোলা আকাশ; ছায়া নাই, তাপ নাই, গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই। বলা বাহুল্য, গ্রীষ্মের অপরাহ্নটুকু বেড়াইয়া এই স্নিগ্ধ ভাবটুকু চিরস্থায়ী বলিয়া মনে হইয়াছে।

পরদিন সকালে উঠিয়া যে আয়োজন দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, সারা গ্রামখানি আজ মোড়ল-বাড়ি পাতা পাড়িবে। প্রকাণ্ড এক তাগাড় কাটা হইল, একসঙ্গে আট-দশটি হাঁড়ি চাপিতে পারে। শুনিলাম মণ-কয়েক চাল রান্না হইবে। মোড়লদের একখানি বড় ঘর খালি করিয়া এধার ওধার কলাপাতা বিছাইয়া দিল, পাতার উপর ফরসা চাদর পাতিল, উহার উপর ভাত ঢালা হইবে। ডাল ঢালিবার জন্য প্রকাণ্ড দুইটা জালা আনানো হইল। রামায়ণে পড়িয়াছিলাম, ছয় মাস অন্তর জাগিয়া কুম্ভকর্ণ এমনই আহার করিয়া থাকেন। আজ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, না জানি কোন্ কুম্ভকর্ণের জন্য চাষা-গাঁয়ের এই বিপুল আয়োজন!

যাহা হউক, ভোজের সময় দাঁড়াইয়া দেখিলাম, এক একজন লোক যাহা খাইতেছে তাহা দেখিবারই মত। শুধু ভাত শুধু ডাল তিন-চার থালা দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল, তরকারি পাতে পড়িতেছে তো কথাই নাই। আর সে কি তরকারি খাওয়ার ঘটা! আমাদের বাড়িতে দশ-বারো জন দুই বেলায় যে এক কড়াই তরকারি খাইয়া থাকে উহারা এক একজনে অনায়াসে সেই পরিমাণ তরকারি খাইয়া বলিতেছে,

আম্মা যা হয়েছেন, উত্তম! আর একটু সুক্তুনি দাও তো মা-ঠাকরোণ।

সন্ধ্যা হইতে আর ঘণ্টাখানেক দেরি আছে, এমন সময় দিদিমা বলিলেন, আশু, জামাকাপড় প'রে নে, আজই আমরা যাব।

মোড়লরা কি যাইতে দেয়!

হেই মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর একটা দিন থেকে যাও। সেবা হ'ল না, যত্ন হ'ল না, ছিচরণে দুটো কথা হ'ল না। হেই মা!

পুনরায় শীঘ্র আসিবার আশ্বাস দিয়া দিদিমা বিদায় লইলেন। বড় মোড়ল আমায় কাঁধে চাপাইয়া কহিল, চলেন খোকাবাবু।

কাঁধে উঠিতে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু মোড়ল নাছোড়বান্দা। খেয়ার নৌকায় চাপাইয়া আমাদের প্রণাম করিয়া মোড়ল বলিল, আবার আসবা ঠাকুর। শীতকালে খেজুর অস, পাটালি গুড় খাওয়াবো। ওরে কানাই, সঙ্গে যা। এই মুগ আধ মণ, কলুই আধ মণ আর আনাজগুলো মা-ঠাকরোণের বাড়ি পৌঁছে দে গা। এই গাঁঠরিটা নে, বস্তোর আছে। কুমড়ো দুটো দেতাম, তা মা কি বইতে পারবা?

খুব পারব।

তবে হেই মাজি ভাই, দাঁড়া, একদৌড়ে কুমড়ো দুটো এনে দেই।

মোড়ল ছুটিয়া চলিয়া গেল ও দুইটা বড় বিলাতী কুমড়া আনিয়া নৌকার উপর রাখিয়া পুনরায় প্রণাম করিল। আর মা, এই পাঁচটা ট্যাকা আমাদের দেবতাকে পূজো দিও গো। তোমার মদনগোপাল ভারি জাগন্ত দেবতা গো। সেবার ওনারে মানত ক'রে একগাছ কাঁটাল হয়েল, কিন্তু এমনই আলিস্যি ধরল, যাই যাই ক'রে যেতে পারলাম

না। সেদিন মোরে স্বপনে বললেন, তোর কাঁ্যাটাল খাওয়ালি নে ব্যাটা, দেখ শেয়ালে খেয়ে গেছে। ওমা, সকালে উঠে দেখি, বড় আটটা কাঁ্যাটাল শেয়ালে আর কিছু আখে নি গো। মনে মনে ঠাকুরের কাছে নাক-কান মললাম।

মোড়লের কথার মাঝেই নৌকা ছাড়িল।

লোকটা দেখিতে কুশ্রী হইলে কি হয়, মনটি ভারি সাদা।

দ্বিতীয় বার যখন মণ্ডল-বাড়ি যাই, সে পাঁচ বছর পরের কথা। দিদিমা বুড়া হইয়াছেন, একা যাইতে কষ্ট হয়, আমাকেই সঙ্গী লইলেন। মামার ছেলেরা বড় দুরন্ত, বুড়ীর পিছনে লাগিয়াই আছে। বুড়া হইলেই ভুলভ্রান্তি মানুষের পদে পদে ঘটে। সেই ভুলের সুযোগে উহারা এমন ঠাট্টা করে যাহাতে দিদিমা সময়ে সময়ে কাঁদিয়া ফেলেন। সেইজন্য দিদিমা উহাদের সঙ্গে লইতে চান না। আমার ছুটি অবশ্য দুই দিন; আজ গিয়া কাল সকালে ফিরিতে পারিব, সুতরাং রাজী হইলাম। আরও, গঙ্গার ধারে সেই পাঁচ বছর আগে দেখা গ্রামখানি কল্পনায় বেশ একটু রং ধরাইতেছিল।

সমস্ত পথ এবং পারঘাটা সহসা এমন বদলাইয়া গেল কেন? পাঁচ বছরে অনেক রং ফিকা হইয়াছে, রূপের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পথের ধূলায় মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে।

পার হইয়া বলিলাম, গঙ্গার ধারে ধারে চল দিদিমা, সেই শেকড়-বার-করা আমগাছটার ধার দিয়ে উঠব।

দিদিমা হাসিলেন, ওঁা আমার কপাল! সে আমবাগান কি আর

আছে! সে গঙ্গার মধ্যে! মোড়লরা এক কোশ দূরে উঠে গিয়েছিল, গঙ্গার এমন কোপ সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে।

মুহূর্ত্তে সমস্ত গ্রাম-সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া গেল। এখনও আধ ক্রোশ ধূলা ভাঙিয়া হাঁটিতে হইবে।

কি আর করি, পায়ে উঠিয়া হাটিতে লাগিলাম।

সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ আছে, মাঠে প্রচুর ধান ফলিয়াছে, অগ্রহায়ণের অল্পায়ু অপরাহ্নে মাঠে মাঠে সোনার সূর্য্যরশ্মি। ফিঙে পাখীর কাকলি ধানভরা ক্ষেতের উপর আশীর্ব্বাদের মত ভাসিয়া চলিয়াছে। চাষী বসিয়া তামাক টানিতেছে, আর এই পরম সম্পদভরা ক্ষেতের পানে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছে।

আমার মন বছর-পাঁচেক পূর্ব্বে মোড়ল-বাড়ির চালাঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছে। কোথায় সে কোলাহল? সম্পন্ন সুসমৃদ্ধ গৃহস্থালীর শতমুখোৎসারিত জীবন-চাপল্য? কোথায় সন্ধ্যার তরল অন্ধকার তুলসীমঞ্চের স্নিগ্ধ দীপালোকে উপরের নক্ষত্রভরা আকাশের মতই সুকোমল হইয়া উঠিবে, দীপের আলোয় দিদিমা কম্বল পাতিয়া বসিবেন, আর সম্মুখে পুরাণ-কাহিনী শুনিতে ভক্তিমতী পল্লীনারীরা স্তব্ধবাক্যে করজোড়ে আঁচলে পা ঢাকিয়া বসিবে? শত রকমের সরল প্রশ্ন—নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকাশ যাহাতে পরিস্ফুট, তেমন ধারা প্রশ্নে দিদিমার কাহিনীকে তাহারা শতবার বাধা দিতে থাকিবে। দিদিমা বিরক্ত হইবেন, আবার হাসিয়া বাধাপ্রাপ্ত কাহিনীর সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইবেন।

বহুদূর হাঁটিয়া অবশেষে মোড়ল-বাড়ি পাইলাম।

এতটা সঙ্কীর্ণ স্থানে উহাদের কেমন যেন খাপছাড়া বোধ হইল। কুঠুরিগুলি তেমনই দক্ষিণমুখী, কিন্তু আয়তনে ছোঁট, দাওয়া সঙ্কীর্ণ।

দাওয়ায় ও ঘরে তেমন মুগ কলাই বা ধান চালের ছড়াছড়ি নাই। ছোট গোয়াল-ঘর। হাঁসের প্যাকপ্যাক শব্দ বা ছাগলের তীব্র ধ্বনি শুনিলাম না, ঢেঁকিশালে সেই বড় ঢেঁকিটাই আছে, উঠানের মরাই সংখ্যায় ও আয়তনে কমিয়া গিয়াছে। কতটুকুই বা উঠান! আমাদের পুব-দুয়ারী ঘরটি তেমনই আছে, আলনায় গুরুর জন্য অস্পর্শিত শয্যা, গুরুর ব্যবহারোপযোগী জিনিসগুলি স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখা। তেমনই পদপ্রক্ষালনের আয়োজন ও পাদোদক গ্রহণ।

কিন্তু বড়বউয়ের মুখের হাসি স্তিমিতপ্রায়। রুগ্ন মুখে কতকগুলি শিরা প্রকট হইয়াছে। মেজ ও সেজ বউ আর তেমন স্বাস্থ্যবতী নাই। হাতে পৈঁছা, খাড়ু সবই আছে, কেবল বিষণ্ণ চাহনিতে ও ধীর মন্থর চলনে এমন একটি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে যাহা পূর্ব্ব-সম্পদের ভগ্নশ্রী মাত্র।

ততগুলি প্রফুল্লমুখ ছেলেও দেখিলাম না। ছেলেগুলি অতিরিক্ত রুগ্ন। দেহের কালো রং কেমন যেন ফ্যাকাসে, মুখগুলি জ্যোতিহারা। রুগ্ন, দুর্ব্বল, তেমন করিয়া উঠানে লাফাইতে তো পারেই না, কথা কয় কেমন গম্ভীরভাবে, মাথা নাড়ে বিজ্ঞের মত।

এ কোন্ মণ্ডল-বাড়ি দিদিমা আমায় আনিয়া ফেলিলেন? একটি ছেলেকে পরিচিতবোধে কহিলাম, ষষ্ঠী না? মাঠে যাবি?

ছেলেটি মাথা নাড়িয়া বলিল, না গো ঠাকুর; ঠাণ্ডি লাগবে। কাল সক্কালে যাব, মোদের যে ম্যালোয়ারি হয়েছে।

বলিলাম, বেশ তো, বেশি দূর কেন, ওই মাঠটাতে একটা খেজুর-গাছ দেখলাম, রস খেয়ে আসি, চ।

ও যে গফুরদের গাছ, অসের জন্যে জান দেব ঠাকুর? কাল উই যে গো-ভাগাড়ের মাঠ, হোথাকে মোদের গাছ আছে, তোমারে অস খেইয়ে আনবো ঠাকুর।

কেন, এ সব জমি তোদের নয় ?

মোদের জমি আদ্দেক গেল গাঙে, আদ্দেক আবাদ হয় না। বাবা আসতেছে, ওনারে স্বদোও গো।

মোড়ল, না তাহার শীর্ণ কঙ্কাল ? কেবল গোঁফজোড়াটি আর বড় চোখ দুইটিতে তাহাকে চেনা যায়।

কাছে আসিয়া কহিল, কি ঠাকুর, অস খাবা ? আচ্ছা। সেই আলে ঠাকুর, দু বছর আগে আসতে পারলে না ? পেরাণ ভ'রে অস খাওয়াতাম। মা-ঠাকরোণ, ভাল ?

হ্যাঁ, ভাল। সবই শুনেছি, তা বাবা, একটু মন দিয়ে কাজকর্ম্ম কর।

হাত্তোরি মন ! দেবতার বাদ, মানষে কি করতে পারে ? গাঙে ঘর গেল, জমি গেল, ভেবেলাম, মরুক গে, ভাই কটা তো আছে, বুকের জোরে নোকসান পুইষে নেব। তা এমন থানে এলাম মা-ঠাকরোণ, রোগের জ্বালায় জেরবার। ভিটে ছেড়ে এসে দুটো মাসও গেল না, বিয়ের যুগ্যি সোমত্ত ভাইটা ওলাউঠোয় অক্কা পেল। শোক সামলে উঠতে না উঠতে ছোট মলেন পিলে-জ্বরে। তারপর দেখছ তো, আমার জ্বর, মেজটার জ্বর, বউগুলো ধুঁকছেন, বাচ্চাগুলো মর-মর। এ হাবাতে জায়গার মাথায় মারি ঝাঁ্যাটা, রোগে মানুষেরে ন'ড়ে বসতে দেয় না, খাটবে কোত্থেকে ?

আহা !

আবার সব্বনাশী এয়েছেন। মণ্ডলের ভিটে বড় মিঠে কিনা, এয়েছেন। আর দুটো বছর সবুর করবেন না, দেখ নি তো, বার্ষেকালে। ভিটে যায় যায়। মরণ হয় তো বাঁচি মা, নইলে বাস উইটে যাই কোথায় বল তো ?

তাই তো, এবার না হয় বেলেডাঙায় যা। দেবতার কোপ!

কোপ? কোপ কিসের? পূজো পান না? পাঁঠা যে কত দিয়েছি, অক্তে মাটি লাল হয়ে গেছে। তা নয়, আমাদের খাবে, সব্বনাশীর ঝোঁক। তা খা, পাঁঠা আর দিচ্ছি নে, আমাদের খা। উ-হু-হু, আবার বুঝি কাঁপুনি এলেন। বউ রে বউ, কাঁথাখানা দে, বড্ডা শীত, কাঁথাখানা দে। ওরে ভুবন রে ভুবন, ওই পচ্ছিমের মাঠ থেকে ঠাকুরের জন্যে এক কলসি অস এনে দিস। উ-হু-হু, বড্ডা শীত, অস এনে দিস রে, অস এনে দিস।

মোড়ল কাঁথার মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

খানিক পরে সেজবউ আসিয়া দিদিমার কাছে বসিল ও ফিকফিক করিয়া হাসিতে লাগিল।

দিদিমা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁলা, হাসছিস যে?

সেজবউ হাসিতে হাসিতে বলিল, মা-ঠাকরোণ, একটা কথার জবাব দাও তো। আসকে পিঠে গড়বার সময় যদি কেউ বলে—

সাদা গুঁড়ি বকের পাক
যেমন গুঁড়ি তেমনি থাক।

তা হ'লে সে কথা ফলে?

ফলে বইকি। ও যে পিঠে-খারাপ-করার মন্তর।

ফলে? ফলে? হি-হি-হি। দিদি বলে, মিছে কথা। ফলেই তো।

সাদা গুঁড়ি বকের পাক
যেমন গুঁড়ি তেমনি থাক।

বুলেলাম, ফ'লে গেল। একেবারে কাঁচা পিঠে, ভ্যাৎভেতে চাল। যেমন খাওয়া, অমনই মা ওলাবিবি এলেন। উঃ, মাগো!

হঠাৎ তীব্র একটা চীৎকার করিয়া সেজবউ সেইখানে লুটাইয়া পড়িল।

মেজবউ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, কি হ'ল মা?

পিঠে খাওয়ার কথা বলছিল—

মেজবউ বলিল, কি একটা ছড়া বলে! যাক, তুমি বলেছ তো মা, মিথ্যে কথা?

হতভম্বের মত দিদিমা বলিলেন, তা তো জানি না মা, বললাম, সত্যি মন্তর।

মেজবউ কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, সব্বনাশ করেছ মা। ন-দ্যাওর যেদিন মরেন, তার আগের দিন ছেল পিঠে-পাব্বন। বড়দি পিঠে ভেজেলো কাঁচা-কাঁচা, ওই আবাগী নাকি চুপি চুপি পিঠে-খারাপ-করা মন্তর পড়েল। দ্যাওর এল মাঠ থেকে, বলে, বড্ডা খিদে, পিঠে দে। বড়দি বলল, দাঁড়া, ভাল পিঠে ভেজে দিই। শোনলে না মা, সেই কাঁচা পিঠে গুড় দিয়ে খেলে। সেই আত্তিরে ভেদবমি—

আঁচলে চোখ মুছিয়া মেজবউ বলিতে লাগিল, দ্যাওর মলো, সেজবোর হ'ল মাথা খারাপ। যাকে পায় শুধোয়, হ্যাগা, সত্যি? মন্তর ফলে? আমরা বলি, না।

তাই তো বউ, আমি তো কিছুই জানি নে। দেখ, তোরা ভাল ক'রে ঠাকুরের পূজো দে, তোদের ভিটে বদলে দেখছি নানান খানা লেগেছে। ওখানে তো রোগ-ঘোগ ছিল না, এখানে এসে একি!

তুমি পায়ের ধূলো দাও মা-ঠাকরোণ, সব যেন বজায় থাকে। ইদিকে ভাইরে মারধোর গাল দেতেন, কিন্তুক সে মরার পর সব্বাই হুপ্ভাঙা হয়েছে। ওই দেখ মা, ভাঙা ছাইকেল ফেলেন নি, চালের বাতায় গোঁজা অয়েছেন।

সহসা ওদিক হইতে বমির শব্দ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বড়বউয়ের গলা, এই কটি কক্কড়ো ভাত, নেবুর অস দিয়ে খেয়ে ফ্যাল গো, ফ্যাল। দুরন্ত আত গো। সারাদিন টো-টো ক'রে মাঠে ঘোরা, ন্যাও, খেয়ে ফ্যাল।

দুঃ হারামজাদী, ওয়াক। ক্যাঁথা দে, উ-হু-হু, চেপে ধর, ওয়াক।

মেজবউ বলিল, আত-উপুসী থাকা কি ভাল, মা-ঠাকরোণ? ওনার বড্ডা ন্যাকারের ধাত, খেলেই ওয়াক। আমাদের ওনারা জ্বর এলেও চাড্ডি খায়। সারা দিনে গতর-জল-করা ছেরোম, না খেয়ে কে পারে, মা?

নদীর মত এই পরিবারেও ভাঙন ধরিয়াছে। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ, বাড়ির নীচে খরস্রোতা গঙ্গা, আলো হাওয়ার অপ্রতুলতা কোথাও নাই, তথাপি রোগের বীজ কোথা দিয়া যে গ্রামের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়, কে বলিবে?

পরের দিন সকালে মাঠে মাঠে বেড়াইলাম। মাঠ বহুদূরবিস্তৃত, মুগ, কলাই, মটর অজস্র ফলিয়াছে। সুপক্ক ধানের ভারে গাছগুলি মাটির পানে হেলিয়াছে, শিস দিয়া গান গাহিয়া কঙ্কালসার রুগ্ন চাষী মাঠে মাঠে ফিরিতেছে। প্রভাতের সূর্য্য সোনার রৌদ্র ঢালিয়া উহাদের অভিনন্দিত করিতেছেন। কিন্তু ভিন্ন গাঁয়ে মোড়লদের জমি অল্পই। ফণী-মনসার বেড়া-দেওয়া প্রকাণ্ড মাঠ, পূর্ব্ববঙ্গের কোন মুসলমান প্রজা আসিয়া জমা লইয়াছে। তাহার কোলে ফলভারে সুসমৃদ্ধ ভুঁই সাঁওতালদের। সাঁওতালরা মজুর খাটিতে এদেশে আসিয়াছিল, আজ জমি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিয়া মহাজন হইয়াছে। স্বাস্থ্য

ভাল, জমিতে দিবারাত্র লাগিয়া থাকে, যে ফসলটি দিলে টাকা আসে তাহা উহারা ভালরকমই জানে।

মোড়লদের জমি একটু দূরে; খাটুনির অভাবে ফসল ভাল হয় নাই। না হউক, জমিদারের খাজনা মিটাইয়া যাহা থাকিবে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন তাহাতে অনায়াসে হইবে।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন জমিগুলির পানে চাহিয়া মনটা কেমন করিয়া উঠিল। মাঠে আর ভাল লাগিল না।

ফিরিয়া আসিয়া দিদিমাকে বলিলাম, বাড়ি চল।

খাওয়া-দাওয়া না ক'রে গেলে ওরা দুঃখু করবে, বুঝলি?

বলিলাম, তবে শিগগির শিগগির রাঁধ, আমার ভাল লাগছে না।

এখনও মোড়লদের কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী আছে, ঘরের নলেন খেজুর-গুড় আছে, দিদিমা পায়স রাঁধিলেন। ছেলে বুড়া পরিতৃপ্তি করিয়া খাইল।

বড়বউ বলিল, মা, তোমাদের এক আন্না, কেমন ভুরভুর ক'রে গোন্দ বেরুচ্ছে। আর আমরা আঁখি গরুর জাব। পোড়া কপাল!

আজ আর বড় মোড়লের জ্বর আসে নাই। পেট ভরিয়া পায়স খাইয়া বলিল, চল খোকাবাবু, তোমারে কাঁধে ক'রে ঘাটে পৌঁছে দেই। আজ গায়ে অনেক বল হয়েছে।

বলিলাম, না, থাক। আমি বেশ হেঁটেই যাব।

হাসিয়া মোড়ল বলিল, বড় হয়েছেন কিনা, নজ্জা। নোকের কাঁধে চেপে যেতে বড় নজ্জা করে, নয় গা?—বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

এবারও মোড়ল মুগ, কলাই, লাউয়ের বোঝা নৌকায় চাপাইয়া দিয়া গেল। প্রণামীর টাকা দিল, কাপড় দিল এবং হাসিমুখে বলিল,

মা-ঠাকরোণ গো, এবার যখন আসবা তখন উই বেলেডাঙায় গিয়ে উঠিছি দেখবা। সব্বনাশী কি মোদের থল বাঁধতে দেবেন গা!—বলিয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল। মনে হইল, ওই কঙ্কালসার কর্কশ চেহারার লোকটি কাঁদিতেছে।

আরও কয়েক বছর পরে যেবার মণ্ডল-বাড়ি যাই সেবার বেলে-ডাঙায় গিয়া উঠিয়াছিলাম। বেলেডাঙায়ও গঙ্গা মণ্ডল-বাড়ির নিম্নে পাড় ভাঙিতেছিল। কিন্তু গঙ্গাকে ভয় করিবার উহাদের অবশিষ্ট আর কিছুই ছিল না। ছোট একখানি বাগান, অর্দ্ধেকটা তাহার গঙ্গাগর্ভে, বাকি অর্দ্ধেকটায় মোড়লদের বাসগৃহ। বাসগৃহ তো বাসগৃহ! মাত্র ছোট দুইখানি ঘরের কোলে ফালি একটু দাওয়া। সঙ্কীর্ণ উঠান, মরাইয়ের চিহ্ন নাই, গরু ছাগলের ডাক শোনা যায় না, এমনকি ছেলেমেয়ের কোলাহলও শুনিলাম না।

বিধবা বড়বউয়ের কোলে পাঁচ বছরের এক রুগ্ন ছেলে মণ্ডল-বংশের শেষ আশা-প্রদীপ। ঝড় এই বংশের উপর দিয়া ভালভাবেই বহিয়া গিয়াছে, মহীরুহ উৎপাটিত হইয়াছে, ছিন্নশাখা অর্দ্ধমৃত এই শিশুতরুমাত্র ধুঁকিতেছে।

বৃদ্ধা দিদিমার পায়ে পড়িয়া মোড়ল-বউ কত দুঃখের কান্নাই কাঁদিল। সে সব বিলুপ্ত গৌরবের করুণ কাহিনী এখানে পুনরুক্তি করিয়া কি-ই বা লাভ?

সংসারে রোগ আছে, মৃত্যু আছে, আরও অনেক বিপদ আছে। মণ্ডল-পরিবারে একে একে সে সবের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার শেষ এখনও হয় নাই, এই রুগ্ন শিশু ও বিধবা রক্ষয়িত্রী তাহার সাক্ষ্য।

গঙ্গাগর্ভে উচ্চ পাড় ভাঙিয়া পড়িয়া যেদিন মণ্ডলদের ভিটাটুকু নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে, সেদিন অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কেহ আর নয়ন অশ্রুসিক্ত করিবে না।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মোড়ল-বউ ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম আর শেষ হয় না। মণ্ডল-বংশের স্থায়িত্ব ও এই সন্তানের আয়ু প্রার্থনা করিয়া মণ্ডল-বউ তুলসীতলায় মাথা কুটিতে লাগিল। বহুক্ষণ প্রার্থনার পর বউ সেই প্রদীপ তুলিয়া লইয়া আমবাগানের মধ্য দিয়া গঙ্গার কূলে গিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপ উঁচু করিয়া বউ দেবীকে সকাতর মিনতি জানাইতে লাগিল, হেই মা, মুখ তুলে চা। ফিরে যা, ফিরে যা। ভিটেটুকুতে আর নোভ করিস নে মা, মুখ তুলে চা।—বাড়ি ফিরিয়া বউ শাঁখে বারকতক ফুঁ দিল।

সন্ধ্যা দেখানো শেষ করিয়া দিদিমার কাছে আসিয়া বসিল ও রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, মা গো, নিত্যি দেবতাকে বলি, ভিটেটুকু বজায় রাখ, বংশধরকে বাঁচা। হেঁ মা, এত কি মহাপাতকী মুই যে মোদের কতা শোনবেন না?

দিদিমা বলিলেন, শুনবেন বইকি মোড়ল-বউ।

পরের দিন সন্ধ্যাকালে খেয়া পার হইতেছিলাম। দুইটি ছোট পুঁটুলি কোলের উপর রাখিয়া মণ্ডলদের ভিটার পানে চাহিয়া ছিলাম। কাঠাখানেক মুগ ও ছোলা আধ কাঠা—দিদিমাও লইবেন না, মোড়ল-বউও ছাড়িবে না, অনেক কান্নাকাটি অনুনয়-বিনয়ে দুইটি পুঁটুলি ও খেয়া-পারের পয়সা লইতে হইয়াছিল।

নৌকার উপর বসিয়া অনেকে অনেক কথা বলিতেছিল।

এমন সময় দূরে আমবাগানের মধ্যে প্রদীপের আলো দেখা গেল। শীর্ণকায়া মণ্ডল-বউয়ের মূর্ত্তি চোখে পড়িল না, প্রদীপটি বারকয়েক আন্দোলিত হইল মাত্র। নদী-দেবতার কাছে নিত্যকার সান্ধ্য-প্রার্থনা বহিয়া যে দীপশিখা আম্র-বনাভ্যন্তরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে তাহার অন্তরালে তপঃক্লিষ্টা মঙ্গলপ্রার্থিনী বধূটিকে মনে পড়িল, দীপের আলোয় যে নদীর প্রসন্নতা মাগিয়া বাস্তুদেবতার স্থিতি কামনা করিতেছে, এবং শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি তুলিয়া ঊর্দ্ধগ দেবতার চরণে বংশধরের আয়ু ভিক্ষা করিতেছে।

কে একজন সেইদিকে চাহিয়া বলিল, বউটার পূজা মা গঙ্গা নিয়েছেন। দেখ নি, এধারে চড়া পড়তে আরম্ভ হয়েছে।

দেবী প্রদীপের আরতি গ্রহণ করিয়াছেন, দেবতা কি মঙ্গল-শঙ্খের ডাক শুনিতে পাইবেন?